তাহারই নীচে শান্তং শিবমদ্বৈতং পুরুষে আত্ম সমাধানের জন্য বেদী স্থাপিত হইয়াছে। এই চতুর্দ্দৃশ্যমান আশ্রম-পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি দেবী এখানকার গৃহী ও পথিক জনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে,

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা।
আজ কর রে জীবনের ফল লাভ।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ।

যখন এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছিল, তখন অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—এই মন্দিরে কোন্ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইবে? আমি তাহার উত্তরে বলিতাম অমূর্ত্তের প্রতিষ্ঠা।

দিব্যোহমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।

সেই প্রকাশবান্ অমূর্ত্ত অজাত পুরুষ যিনি সকলের বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন। অমূর্ত্ত ব'লে কি তাঁকে দেখা যায় না? যায়, শুদ্ধসত্ত্ব ক্ষীণপাপ যতিরা তাঁর দর্শন লাভ করেন।

এখনকার কালে আমাদের দেশে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত, কিন্তু বেদ অথবা উপনিষদে মূর্ত্তিপূজার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। উপনিষদে স্পষ্টই আছে

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ

তাঁর কোন প্রতিমা নাই, যাঁর নাম মহদ্যশ—যাঁর যশোভাতি ভুলোক ও দ্যুলোকের প্রত্যেক অংশে দীপ্যমান। উপনিষদের ঋষিরা আরো বলেছেন

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে,
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

বাক্য যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত—মন যাঁকে মনন করতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক চিন্তা মনন করেন—তাঁকে ব্রহ্ম বলে জান, তিনিই ব্রহ্ম; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা কদাপি ব্রহ্ম নহে। আমাদের উপাস্য দেবতা, যিনি 'অনাদ্যনন্তং' 'মহতোমহীয়ান্', তিনিই এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

বিগ্রহের প্রয়োজন কি? যিনি সর্ব্বব্যাপী—আকাশে যিনি ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রয়েছেন—যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন—

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুতবিশ্বতস্পাৎ। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখঃ সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

সর্ব্বত্র যাঁহার চক্ষু—সর্ব্বত্র যাঁহার মুখ—সর্ব্বত্র যাঁর হস্ত পদ—যাঁর দৃষ্টি ও শ্রুতি সর্ব্বত্রই—যিনি সকল জগৎ ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন—তাঁর কি কোন কাষ্ঠ-পাষাণের প্রতিমূর্ত্তির প্রয়োজন!

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।

"কি ঊর্দ্ধে, কি অধোতে; কি পশ্চাতে, কি সম্মুখে; কি দক্ষিণে, কি উত্তরে; আমাদের চতুর্দ্দিকে সকল স্থানেই তিনি দীপ্যমান রহিয়াছেন। আমরা যদি পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করি, সেখানে তিনি বিরাজমান; যদি গভীর সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করি, সেখানেও তিনি বর্ত্তমান। দিবাকরের মধ্যাহ্ন-কিরণে যেমন তিনি স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন, তদ্রূপ তামসী বিভাবরীর অন্ধতম তিমিরেও জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন। সকল স্থানই তাঁহার রাজ্য, সকল স্থানেই তাঁহার দৃষ্টি।"

বিগ্রহ নাই তবে তাঁহার আরতি কি প্রকার?

"তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ
তাঁর জগত মন্দিরে।"

গুরু নানক এই আরতির সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন,

"গগণ মে থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে
তারকামগুলা জনক মোতী
ধূপ মলয়ানিলো পবন চমরো করে
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি।
কহো কৈসী আরতী হোয়ে
ভবখণ্ডন তেরি আরতী—
অনাহতা শব্দ বাজন্ত ভেরী।"

গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকা-মণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল-বন রাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।

অনাহত অথচ ভেরীর বাদ্যধ্বনি দিশি দিশি উত্থিত হইতেছে।

এ কথা কেহই বলে না যে কাষ্ঠ পাষাণ পুত্তলিকাই স্বয়ং দেবতা। তাঁদের বক্তব্য এই যে অনন্তস্বরূপকে আমরা মনে ধারণা করিতে পারি না—তাঁতে চিত্ত সমাধানের জন্য শালগ্রাম প্রভৃতি একটা কোন চিহ্ন চাই। তা যদি বল তবে সেরূপ চিহ্ন কোথায় না আছে? এই বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতি সেই চিহ্নে পরিপূরিত—

পুষ্পিত কানন, গিরিনদী সাগর,
অযুত অগণ্য লোক—সূর্য্য
চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র তারা—"তাঁর
মহিমা কোথায় না হয় স্মরণ?"

"অভ্রভেদী অচল শিখর, ঘননীল সাগরবর,
যথা যাই তুমি তথা।
রবি কিরণে তব শুভ্র কিরণ
শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি
তব কান্তি মেঘে।
সজন নগর বিজন গহন
যথা যাই তুমি তথা।"

তবে যদি তাঁহার ধ্যানের অবলম্বন কোন চিহ্ন আবশ্যক হয়—আমি বলি তাহা ওঁ। এই অক্ষর আমাদের মন্দিরের চূড়ায় স্থাপিত দেখিতে পাইবেন। ওঁকার ব্রহ্মের প্রাচীন নাম—"ওমিতি ব্রহ্ম;" ব্রহ্মের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়শক্তি এই অক্ষরের অন্তর্ভূত। পুরাণে এই ত্রিশক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন পৃথক পৃথক দেবতা রূপে কল্পিত হয়েছে। ওঁকারের ভিতরে এই তিনই একত্রে সন্নিবিষ্ট। উপনিষদে আছে

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা
ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।

প্রণব অর্থাৎ ওঁকার ধনু, আত্মা তীর, আর ব্রহ্ম তার লক্ষ্য; প্রমাদশূন্য হয়ে সেই লক্ষ্য ভেদ করে—তাঁতে শরবৎ তন্ময় হবে; জ্ঞানী ব্যক্তি ওঁকার সাধনা দ্বারা সেই শান্ত অজর অমর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

আপনারা কেহ যেন এমন মনে না করেন যে কোন সম্প্রদায় বিশেষের জন্য এই মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। এ মন্দিরের অবারিত দ্বার। সকল সম্প্রদায়ের লোকই এখানে স্বাগত। আমি আপনাদের সকলকে আহ্বান করেছি—যখন-যাঁর-ইচ্ছা এখানে এসে আপন ইষ্টদেবতার ভজনা করতে পারেন। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে আর কিছু চান না—আমাদের প্রীতি—আমাদের আন্তরিক ভক্তি চান। গীতায় ভগবান বলিছেন—

ভক্তি সহ যে যা দেয়
পত্র পুষ্প ফল জল আর,
লই আমি সুপ্রসন্ন
ভক্তদত্ত সব উপহার।

গীতার অসাম্প্রদায়িক ভাবের জন্য এই গ্রন্থ আমাদের সকলেরই উপাদেয়,অতি আদরের সামগ্রী। গীতোক্ত আর একটী বচন দেখুন তাহা কেমন উদার, কেমন সারগর্ভ। সে বচনটি এই,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।

আমাকে যারা যে প্রকারে ভজনা করে, আমি সেই রূপে তাদের পরিতুষ্ট করি। লোকে যে কোন পথ দিয়ে যায়, আমাতে গিয়েই পৌঁছে।

"সেই একে নানা লোকে ভজে নানা মতে
কেহ খোঁজে এক পথে কেহ অন্য পথে।"

ভ্রাতৃগণ, এই বিষয়ে গোঁড়ামি ছেড়ে আমাদের উদারতা অবলম্বন করা উচিত। আমরা অল্পবুদ্ধি—অজ্ঞান; যিনি অনন্ত-জ্ঞান-সমুদ্র তাঁকে আমরা কতটুকু জানতে পারি। আমরা তাঁর স্বরূপের একদেশ মাত্র পেয়েই মনে করি এই বুঝি তাঁর সমস্ত। আপনারা অন্ধের দল ও হাতীর গল্প শুনিয়া থাকিবেন। জনকতক অন্ধ মিলে একটা হাতীর বর্ণনা আরম্ভ করে দিলে; তারা ত চখে দেখতে পায় না—স্পর্শ করে তাদের যা কিছু জ্ঞান লাভ হয়েছে। যে কাণে হাত দিয়েছে সে বলে এই জন্তু কুলার মতন; কেউ বলে এটা মূলার মতন; কেউ বলে থাম; কেউ বলে চামর; তার পুচ্ছ, দাঁত, শুঁড়, যে ভাগ যে ছুঁয়েছে, তা থেকেই তার হাতীর ধারণা। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদেরও অনেকটা এইরূপ। আমরা তাঁর একদেশদর্শী, অথচ আপনাদের সর্ব্বদর্শী মনে ভেবে আস্ফালন করি। আমি বলতে চাই না, আমি যতটুকু জেনেছি তাই সত্য,তার আর কোন দিক্ নেই, আর সকলই মিথ্যা, সকলই ভুল। সাধনা দ্বারা ঈশ্বরকে যে যতটুকু জানতে পেরেছে, সে সেই অনুসারে তাঁকে পূজা করে। তাই আমি বলছি আপনাদের যার যেমন বিশ্বাস থাকুক না কেন, এখানে এসে ভগবানের আরাধনা করবার কোন বাধা নেই। কেবল এখানে বিগ্রহের অভাব। এই মন্দিরে অদৃশ্য অরূপের দর্শন করতে হবে। ধ্যান দ্বারা সেই অমূর্ত্ত পুরুষের দর্শন অনেক অভ্যাস—অনেক সাধনা সাপেক্ষ। যিনি অমূর্ত্তের দর্শনাকাঙ্ক্ষী, এই মন্দির তাঁর সাধনার প্রশস্ত স্থান।

এই মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? কেহ কেহ মনে করতে পারেন যে এর জন্য এত ব্যয় ও পরিশ্রম বৃথা নষ্ট। কিন্তু বন্ধুগণ! তা নয়। আমরা অহর্নিশি বিষয়ার্ণবেই মগ্ন রয়েছি, পরমার্থ চিন্তার একটুও অবকাশ পাই না। আমাদের দৃষ্টি বহির্মুখী, অন্তর্দৃষ্টির আমরা সময় পাই না, আত্মহারা হয়ে দীনভাবে জীবন যাপন করি। সেটা কি ঠিক? অর্থের সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থের প্রতিও মনোযোগ করা কি আবশ্যক নয়? এ কালের জন্য আমরা যেমন ধনোপার্জনে ব্যস্ত, অনন্তকালের জন্য কি কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ করা প্রার্থনীয় নয়? সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় হতে নিবৃত্ত হয়ে ভূমা অমৃত-সাগরে এক একবার অবগাহন ক'রে যাতে আমরা সুস্থ সবল হতে পারি, তারই জন্যে এই সকল তীর্থ-স্থানের প্রয়োজন। আমরা অনেক সময় সংসারানলে দীপ্তশিরা হ'য়ে যন্ত্রণা ভোগ করি, এখানে এসে সেই দীপ্তশিরার অভিষেকের সুযোগ হবে। রোগ-শোকে, নানা কারণে

আমাদের ঘোরতর অশান্তির মধ্যে বাস করতে হয়; এই মন্দিরে বিশ্রাম ক'রে শান্তি ও আরাম পাওয়া যাবে, এই উদ্দেশেই এই মন্দির বাঁধা হয়েছে—সিদ্ধিদাতা বিধাতা আমাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন।

আর এক কথা। এখানে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হয় না। বৈদিক ঋষিরা হোম করতেন দেবতাদের প্রসন্নতা লাভের জন্য; যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণ যাজ্ঞিকদিগকে প্রচুর ধন ধান্য দিয়ে পরিতৃপ্ত করিতেন। এইরূপ আদান প্রদানের ভাবে হোম-যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হত। আমাদের হোম-যাগ জীবনের কর্ত্তব্য সাধন। কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের অব্যর্থ উপায়। পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, প্রতিবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য—এই সমস্ত কর্ত্তব্য পালন, দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, রোগীকে ঔষধ পথ্যপ্রদান, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান, এই সকল কার্য্যই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য। এইরূপ যজ্ঞ-অনুষ্ঠানেই তাঁর প্রসাদ লাভ করা যায়। আপনারা এখানে এসে যা কিছু আধ্যাত্মিক রত্ন সঞ্চয় করবেন, মনে রাখবেন তা সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যয় করবার জন্য। আবার যদি কখন বিষয়-কোলাহল হতে দূরে গিয়ে শান্তির ক্রোড়ে ব্রহ্মানন্দ-রসপান করতে ইচ্ছা করেন, তা হলে এই মন্দিরে এসে আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারবেন।

নিখিল-বিশ্বের প্রতিষ্ঠা সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন মঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বরকে অদ্য আমাদের এই নবগৃহে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। সেই সর্ব্বমঙ্গলালয় বিশ্বনিয়ন্তার কৃপায় এই গিরি-মন্দির নিত্য-বিমল-আনন্দের মধুরধ্বনিতে পূর্ণ হউক। নিত্য-পুণ্যের নির্ম্মল প্রভায় ইহা চিরকাল উজ্জ্বল থাকুক—ইহার মঙ্গল আরতির দিব্য-সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হউক। যিনি এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি তাঁহার দর্শনাগত নর-নারীদিগকে নিত্য তাঁহার কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন, পাপ-তাপ দুর্ব্বাসনা হইতে সর্ব্ব প্রকারে মুক্ত রাখুন। সেই কৃপাময় পরমপিতার কৃপাবারি এই মন্দিরের উপর নিয়ত বর্ষিত হউক এবং তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদে ইহা শাশ্বত শান্তির আলয় হইয়া থাকুক। তাঁহারই কৃপায় এই নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের চিত্তপটে নিত্যকাল দিব্য অক্ষরে লিখিত থাকুক যে

"তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা; এবং তাঁহাদের জীবনে এই মহা উপদেশ-বাক্য ফলিত হউক।

রাঁচী ব্রাহ্মসমাজে নববর্ষ উপলক্ষে

আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ।

আজ আমরা বিগত বৎসরের রাশি রাশি বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া নববর্ষে পদার্পণ করিতেছি—সেই জন্য সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বমঙ্গলদাতা পরমপিতা পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে বারবার নমস্কার করি। যে বৎসর অতীত হল, তা থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করেছি? এক কথায় বলা যেতে পারে—সংসারের অনিত্যতা। আমরা স্থির জেনেছি যে এখানে শান্তি নেই, কেবলই পরিবর্ত্তন—সকলই অনিত্য, 'চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।' কিছুই স্থির নয়, এই শিক্ষা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে।

এই অস্থিরপ্রপঞ্চে স্থায়ী ধন কি? এর উত্তরে দুটি জিনিস নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। আত্মশক্তি ও ভগবদ্ভক্তি; এই দুইটি আমাদের অনন্ত জীবনের সম্বল। আমাদের জীবনে যে সকল বিচিত্র ঘটনা ঘটছে, তার মধ্যে আমাদের কখন উত্থান—কখন পতন। এই ঘোর সঙ্কটে আমাদের নেতা হচ্চে আত্মশক্তি। এই শক্তির প্রভাবে আমরা দুই প্রকারে সুরক্ষিত হই;—এক এই যে অশেষ প্রলোভন অতিক্রম ক'রে ঠিক পথে চলতে পারি। আমরা যদি মোহবশতঃ পাপপঙ্কে পতিত হই, তা থেকে উদ্ধার হবার জন্যও আত্মশক্তি প্রয়োজনীয়। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ উদয় হয়েছেন, তাঁরা আত্মপ্রভাবে অমরতা লাভ করেছেন। বুদ্ধদেব এই আত্মশক্তির প্রভাবে 'মার' কে পরাভব ক'রে বুদ্ধত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের এই আত্মশক্তি পরিমিত। এমন কত ঘটনা আসছে যা আমাদের জীবনস্রোতকে আমাদের ইচ্ছার বিপরীত পথে বলপূর্ব্বক টেনে নিয়ে চলেছে; কত দৈবঘটনা যার উপর আমার কোন অধিকার নাই। তার মধ্যে যা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য সে হচ্চে মৃত্যু। গতবর্ষে মৃত্যুর কঠোর আঘাতে কত লোকে হাহাকার করছে। কেহ মাতৃহীন, কেহ পিতৃহীন, কেহ পুত্রশোকে কাতর, কেহ বন্ধুর বিচ্ছেদে ম্রিয়মান, কেহ প্রিয়তমা ভার্য্যা বিয়োগে অজ রাজার ন্যায় বিলাপ করছেন—

> ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা
> বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।
> ধৃতি হল দূর, রতি শুধু স্মৃতিলীন,
> গান হল শেষ, ঋতু উৎসবহীন।

এই মৃত্যু ঘটনা অপরিহার্য্য, কিছুতেই আমরা একে প্রতিরোধ করতে পারি না। এর কাছে আত্মশক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত।

ঈশ্বর চান যে আমরা আত্মশক্তি জাগ্রত করে তাঁর শক্তি উপার্জ্জন করি—এই উদ্দেশে তিনি এই সংসারের পথ দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ করে রেখেছেন। তিনি চান আমরা আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে সেই পথ উত্তীর্ণ হতে পারি। কিন্তু আমরা পদে পদে উপলব্ধি করি আমাদের এই শক্তি কত পরিমিত। কত দিক্ দিয়ে কত প্রকারে তা প্রতিহত হচ্চে! আমাদের চিরন্তন সংস্কার, শিক্ষা, সঙ্গ ইত্যাদি নানা কারণে তার গতিরোধ হচ্চে; নানারকমে ঠেকে শেষে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, যে শুধু শক্তিতে ত্রাণ নেই, তার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি চাই, কোন এক উচ্চতর পুরুষের উপর নির্ভর করা চাই, আপনাকে ছেড়ে ভগবানের শরণ গ্রহণ করা আবশ্যক। ঈশ্বর আমাদিগকে এই সংসার-সঙ্কটে ফেলে রেখে আমাদের ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছেন, তা নয়। মাতা যেমন ক'রে শিশুকে পদচারণা শিক্ষা দেন, তিনি আমাদিগকে সেইরূপে শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন যে, যখনি আমাদের পদস্খলন হয়, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি, তাঁর হস্তধারণ করে অশেষ দুর্গতি হতে পরিত্রাণ পাই। ভ্রাতৃগণ! আমরা তাই এই নববর্ষের প্রারম্ভে পাপতাপে তাপিত হয়ে সান্ত্বনার জন্যে তাঁকে ডাকছি; রোগ-শোকে উৎপীড়িত হয়ে শান্তি-লাভের জন্যে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছি, মৃত্যু-বিভীষিকায় ভীত হয়ে সেই অমৃতের অভয়বাণী ভিক্ষা করিতেছি। সেই রাজরাজেশ্বর আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন—হীনতা মলিনতা বিসর্জন দিয়ে তাঁর কাছে চল। 'নত কর উন্নত মস্তক। দূর কর সমস্ত

বর্ষের সঞ্চিত আবর্জনা, শান্ত হও, পবিত্র হও—তাঁর চরণে প্রণাম করে গৃহে ফের।' আমরা আত্মানুসন্ধান করলে দেখতে পাই যে আমরা অন্তরে কোন না কোন গূঢ়-পাপ পোষণ ক'রে রেখে, কোন না কোন কু প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে আপনাদের অধঃপাতের সূত্রপাত করেছি। কেহ আলস্যের দাস, কেহ লোভের, কেহ ক্রোধের অধীন। প্রতিজ্ঞা কর যে আজ হতে এইরূপ আসক্তি বিসর্জন দিয়ে জীবনের নূতন পৃষ্ঠা সুরু কর্‌বে। সেই সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে সম্মুখে দেখে তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা কর—তিনি আমাদের প্রতিজ্ঞাপালনে সক্ষম করবেন। সাধু যার চেষ্টা, ঈশ্বর তার সহায়।

> "সরল হৃদয় লয়ে চল সবে
> অমৃতের দ্বারে, কত সুধা মিলিবে।
> দুর্ব্বল সবল, ভীরু অভয়,
> অনাথ গতিহীন হয় সনাথ,
> সেই প্রেমশশী যবে মধু বরষে
> সাধুর হৃদয়াধারে।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,
মঙ্গল।

আপনার প্রতি ও সাধারণের প্রতি।
পঞ্চম উপদেশ।

আমরা জানিয়াছি—নৈতিক হিসাবে, আমাদের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে; আমরা জানিয়াছি এই ভাল মন্দের প্রভেদ হইতেই অবশ্যকরণীয়তার উৎপত্তি—একটা নিয়মের উৎপত্তি—অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্য সকলের উৎপত্তি। কিন্তু আমরা এখনও জানিতে পারি নাই—এই কর্ত্তব্যগুলি কি? শুধু কর্ত্তব্য-নীতির সাধারণ মূলতত্ত্বটি স্থাপিত হইয়াছে মাত্র, কার্য্যত ইহার কিরূপ প্রয়োগ হয়, এক্ষণে তাহাই দেখা আবশ্যক।

যদি, কোন সত্য অবশ্যকরণীয় হইলেই তাহা কর্ত্তব্য নামে অভিহিত হয় এবং যদি শুধু প্রজ্ঞার দ্বারাই সেই সত্য জানা যাইতে পারে তাহা হইলে, কর্ত্তব্য-নিয়মকে মানিয়া চলাও যা' প্রজ্ঞাকে মানিয়া চলাও তা'—একই কথা।

কিন্তু "প্রজ্ঞাকে মানিয়া চলা"—এই কথাটি বড়ই অস্পষ্ট ও সূক্ষ্মধারণামূলক। আমাদের কোন কার্য্য প্রজ্ঞার অনুসারী কিংবা প্রজ্ঞার অনুসারী নহে, তাহার কিরূপে নিশ্চয় হইবে?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রজ্ঞার একটি লক্ষণ সার্ব্বভৌমতা, আমাদের কার্য্য এই প্রজ্ঞার অনুসারী হইতে হইলে, এই কার্য্যেতেও কতকটা সার্ব্বভৌমের লক্ষণ থাকা আবশ্যক। আবার আমাদের কার্য্য-প্রবর্ত্তক অভিপ্রায়ের উপর আমাদের কার্য্যের নৈতিকতা নির্ভর করে; যদি কোন কাজ ভাল হয়, সেই কাজের অভিপ্রায় হইতেও প্রজ্ঞার লক্ষণ প্রতিভাত হয়। কি নিদর্শন দেখিয়া বুঝা যাইবে যে অমুক কাজ প্রজ্ঞার অনুসারী—কিংবা সেই কাজ ভালো? যদি কার্য্যপ্রবর্ত্তক কোন অভিপ্রায়কে বিশ্ব-বিধানের অন্তর্গত এমন একটি নীতি-সূত্র বলিয়া উপলব্ধি করিতে পার, যাহা প্রজ্ঞা সমস্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট স্বাধীন জীবের অন্তরে স্থাপিত করিয়াছেন—তাহা হইলে বুঝিবে উহাই প্রজ্ঞানুসৃত কাজের নিদর্শন—ভাল কাজের নিদর্শন। তদ্বিপরীতই মন্দ কাজ। যদি তোমার কোন অভিপ্রায়কে সার্ব্বভৌম নিয়মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পার, তাহা হইলে বুঝিবে সেই কাজ ভালোও নহে মন্দও নহে,—উহা উপেক্ষণীয়। জর্ম্মান দার্শনিক কাণ্ট এইরূপ মানদণ্ড প্রয়োগ করিয়া, কার্য্যের নৈতিকতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ন্যায়ের কঠোর অবয়ব

পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যেরূপ যুক্তির দ্বারা সত্য ও ভ্রান্তি নির্ণয় করা হয়, সেইরূপ উক্ত নৈতিক মান-দণ্ডের দ্বারা, আমাদের কি কর্ত্তব্য, ও কি কর্ত্তব্য নহে, তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হয়।

প্রজ্ঞাকে অনুসরণ করা—ইহা নিজেই একটি কর্ত্তব্য; এই কর্ত্তব্যটি—প্রজ্ঞার সহিত স্বাধীনতার যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এমন কি, একথা বলা যাইতে পারে,—আমাদের শুধু একটিমাত্র কর্ত্তব্য, সেটি কি?—না প্রজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া চলা। কিন্তু মানুষ, বিচিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায়, এই সাধারণ কর্ত্তব্যটি, বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আমার নিজের সহিত আমার যেরূপ নিত্য সম্বন্ধ এরূপ আর কাহারও সহিত নহে। অন্যান্য কার্য্যের যেরূপ নিয়ম আছে, সেইরূপ মানুষ যে সকল কার্য্যের কর্ত্তা ও বিষয়, তাহারও একটা বিশেষ নিয়ম আছে। এই শ্রেণীর কার্য্যের যে কর্ত্তব্য উহাই মানুষের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য।

প্রথম দৃষ্টিতে ইহা একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় যে, নিজের প্রতি মানুষের আবার কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে।

মানুষ স্বাধীন বলিয়া, মানুষ আপনার নিজস্ব। আমার সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় কে?—না, আমি নিজে;—ইহাই আমার প্রথম স্বত্বাধিকার; ইহার উপর অন্যান্য স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত। স্বত্বাধিকারের মূল কথাটি কি?—না স্বত্বাধীকারী নিজ ইচ্ছামত তাঁহার সম্পত্তির ব্যবহার করিতে পারে, অতএব আমার নিজের সম্বন্ধে আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কি আমি করিতে পারি না?

না, তাহা পারি না। মানুষ স্বাধীন, নিজের উপর মানুষের অধিকার আছে বটে—তাই বলিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক নহে, যে, মানুষ আপনার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। বরং মানুষের স্বাধীনতা আছে বলিয়াই,—বুদ্ধি আছে বলিয়াই আমার মনে হয়, মানুষ তাহার স্বাধীনতার ও তাহার বুদ্ধির অবনতি সাধন করিতে পারে না। স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন করাই স্বাধীনতার অপব্যবহার করা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিঃ—স্বাধীনতা যে শুধু অন্যের নিকটেই পূজ্য তাহা নহে, উহা নিজের নিকটেও পূজ্য।

কর্ত্তব্যের উদার অনুশাসনে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে বর্দ্ধিত না করিয়া, যদি আমরা তাহাকে প্রবৃত্তির অধীন করিয়া রাখি, তাহা হইলে আমরা অভ্যন্তরস্থ এমন একটি জিনিসকে হীন করিয়া ফেলি, যাহা আমাদের নিজের ও অপরের শ্রদ্ধার বিষয়। মানুষ একটা জিনিস নহে, সুতরাং নিজের প্রতি একটা জিনিসের মত ব্যবহার করিবার অধিকার মানুষের নাই।

যদি আমার নিজের প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকে, তবে সে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য নহে—সে সেই স্বাধীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কর্ত্তব্য—যে স্বাধীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া আমার নৈতিক "পুরুষটি" সংগঠিত হইয়াছে।

কোন্ জিনিসটি আমাদের নিজের, এবং কোন্ জিনিসটি বিশ্বমানবের তাহা ভাল করিয়া নির্ণয় করা আবশ্যক। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে মানবপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সমস্ত উপাদানগুলি সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু এই সকল উপাদানগুলি বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তির অন্তরে বিশেষ বিশেষ প্রকারে সন্নিবিষ্ট।

এই বিশেষত্ব হইতেই ব্যক্তি গঠিত হয় কিন্তু পুরুষ গঠিত হয় না। আমাদের অন্তরে যে পুরুষটি আছেন কেবল সেই পুরুষই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ও পবিত্র, কারণ সেই পুরুষই বিশ্বমানবের একমাত্র প্রতিনিধি। যাহাতে নৈতিক পুরুষের কোন আস্থা নাই, তাহা ভালও নহে, মন্দও নহে, তাহা উপেক্ষণীয়। ভালও নহে, মন্দও নহে—এই সীমা-গণ্ডির মধ্যেই আমি আমার যাহা অভিরুচি তাহা করিতে পারি, এমন কি আমার খেয়ালও চরিতার্থ করিতে পারি, কারণ উহার মধ্যে অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই নাই,—উহার মধ্যে ভালও নাই—মন্দও নাই। কিন্তু যখনই কোন কার্য্য, নৈতিক পুরুষের সংস্পর্শে আসে, তখনই আমার ইচ্ছা তাঁহার শাসনাধীনে স্থাপিত হয়,—প্রজ্ঞার শাসনাধীনে স্থাপিত হয়—যে প্রজ্ঞা স্বাধীনতাকে কিছুতেই নিজের বিরুদ্ধে যাইতে দেয় না। তাহার দৃষ্টান্ত,—যদি আমি কোন খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, কিংবা বিষাদের আবেগে, কিংবা আর কোন অভিপ্রায়ে, আমার শরীরকে অত্যন্ত নিগ্রহ করি, যদি দীর্ঘকাল অনিদ্রায় যাপন করি, সমস্ত নির্দ্দোষ সুখ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করি, এবং এইরূপে যদি আমি আমার স্বাস্থ্যের হানি করি, জীবনকে বিপন্ন করি, বুদ্ধিবৃত্তিকে নষ্ট করি—তাহা হইলে এই সব কাজ আর উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। তখন সেই সব কাজের পরিণাম স্বরূপ আমাদের রোগ, মৃত্যু, কিংবা উন্মাদ মহাপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, কেন না আমরা স্বেচ্ছাক্রমেই উহাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছি।

আমার অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষটিকে আমি শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য;—এই বাধ্যতা, এই অবশ্যকর্ত্তব্যতা আমি নিজে স্থাপন করি নাই, সুতরাং আমি নিজে উহাকে ধ্বংস করিতেও পারি না। চুক্তিকারী দুই পক্ষ রাজি হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যেমন স্বীয় চুক্তি রহিত করিতে পারে, সেইরূপ স্বেচ্ছাকৃত কোন চুক্তির উপর কি এই আত্মশ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত? এই চুক্তির দুই পক্ষই কি "আমি"?—না। ইহার এক পক্ষ আমি নহি—ইহার এক পক্ষ বিশ্বমানব—বিশ্বমানবের প্রতিনিধি আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষ। এবং এস্থলে ইহা কোন বন্দোবস্তও নহে, চুক্তিও নহে। নৈতিক পুরুষটি শুধু আমাদের অন্তরে আছেন বলিয়াই আমরা তাঁহার শাসন মানিতে বাধ্য;—তাঁহার সহিত আমাদের কোন বন্দোবস্ত নাই—কোন চুক্তি নাই। এ বাধ্যতার বন্ধন অচ্ছেদ্য।

আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষকে শ্রদ্ধা করা—এই সাধারণ মূলতত্ত্বটি হইতেই আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য সমুৎপন্ন। ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

জাতিভেদ।

"জাতিভেদ" কথাটা মুখে আনিতেও আজকাল সংকুচিত হইতে হয়। অনেকে হয়ত বলিবেন, মানুষের আবার জাতিভেদ কি? সব মানুষ এক জাতি। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষক ইংরাজ, অন্য এক প্রকার জাতিভেদ বর্ণন করেন সত্য, পরন্তু সে সকলের কোন প্রকার আচারভেদ থাকা বা হওয়া উচিত মনে করেন না। প্রাচীন হিন্দু ব্যবস্থাপকেরা উহার বিপরীতবাদী। হিন্দু মুনিঋষিরা যেমন জাতিভেদবাদী ছিলেন, তেমনি আচারভেদবাদীও ছিলেন। ইংরাজ বর্ণিত জাতিভেদ

কথা একরূপ, মুনিঋষিগণের বর্ণিত জাতিভেদ কথা অন্যরূপ।

ইংরাজ বলেন, পৃথিবীস্থ মনুষ্য প্রধানতঃ পাঁচ বর্ণে বিভক্ত। ককেশীয়, মোগল, মালাই, আমেরিক, ও আফ্‌রিক। উক্ত পাঁচ বর্ণের (জাতির) মধ্যে ককেশীয়বর্ণের লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক। আফ্‌রিক বর্ণের লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ব্বোধ ও ধর্ম্ম-বিষয়ে অনভিজ্ঞ। জ্ঞানের বা বুদ্ধির ও অন্যান্য মানসিক শক্তির বাসস্থান মস্তিষ্ক; তাহারই অল্পতা ও আধিক্য ঐ প্রকার বর্ণভেদের কারণ। আফ্‌রিক বর্ণের লোকের মস্তিষ্ক অপেক্ষা ককেশীয় বর্ণের লোকের মস্তিষ্ক-পরিমাণে অনেক অধিক এবং সংস্থানেও কোন কোন অংশে অন্যরূপ। সেই জন্য ককেশীয় বর্ণের লোকেরা অধিক বুদ্ধিমান ও আফ্‌রিক বর্ণের লোকেরা হীন-বুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত। বুদ্ধ্যাদির আধার মস্তিষ্ক পদার্থের ঐরূপ পরিমাণাদি অর্থাৎ ঐরূপ অল্পাধিক্য ও সন্নিবেশ সেই সেই দেশের ভৌম প্রকৃতির ও জল বায়ু প্রভৃতির প্রভাবে আত্মলাভ করে বা উৎপন্ন হয়। সুতরাং উক্ত প্রভেদ নির্ণয় সেই সেই দেশের নামঘটিত হওয়া সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নহে, ইত্যাদি।

প্রাচীন হিন্দু মুনিঋষিদিগের ব্যবস্থিত জাতিভেদ কথা এইরূপ,—

মনুষ্যসকল পঞ্চবর্ণে বিভক্ত। প্রথম ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় ক্ষত্রবর্ণ, তৃতীয় বৈশ্যবর্ণ, চতুর্থ শূদ্রবর্ণ এবং পঞ্চম বর্ণ নিষাদ অর্থাৎ ম্লেচ্ছবর্ণ। ইংরাজ পণ্ডিতদিগের বর্ণবিভাগ-ব্যবস্থা মস্তিস্ক পদার্থের পরিমাণ গত অল্পাধিক্য ঘটিত; পরন্তু প্রাচীন ঋষিদিগের অভিহিত বর্ণবিভাগ, সত্ত্ব-রজ-স্তমঃ এই তিন গুণের উৎকর্ষাপকর্ষ ঘটিত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতীয় দেহে সত্ত্বগুণের আধিক্য বা উৎকর্ষ, ক্ষত্রজাতীয় দেহে সত্ত্বগুণের তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অপকর্ষ, বৈশ্য বর্ণের দেহে তদপেক্ষা অধিক অপকর্ষ, শূদ্রদেহে আরও অধিক অপকর্ষ। ম্লেচ্ছদেহে উক্ত সত্ত্বগুণ একেবারে অভিভূত, ও রজ স্তমোগুণের প্রাবল্য দৃষ্ট বা লক্ষিত হয়। এই বেদোক্ত বর্ণভেদ-কথা ভগবদ্গীতায় "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম-বিভাগশঃ।" এই শ্লোকে অনূদিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পৌরাণিক নিবন্ধে ও প্রায় ঐরূপ বর্ণনা আছে। যথা—

মান্ধাতা নামক রাজা নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষে! শরীর-ত সকলেরই একবিধ। ঘর্ম্ম, মূত্র, পুরীষ শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত ইত্যাদি সকল শরীরেই সমান; তথাপি আপনি বলিতেছেন, মানুষ সব এক বর্ণের নহে। তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ বর্ণ-ভেদ আছে। ইহা কিরূপে সঙ্গত হয় তাহা আমাকে বলুন। নারদ বলিলেন,—

> ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
> ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি গুণৈস্তৎ বর্ণতাং গতম্॥

অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময়, সে ভাবে বর্ণ ভেদ না থাকিলেও, সত্ত্বরজস্তমো গুণের দ্বারা একই মনুষ্য বর্ণ বিভিন্ন বর্ণে পরিণত হইয়াছে।

অধ্যাত্মতত্ত্ববিবেক নামক সংস্কৃত ভাষার একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, শিরোমজ্জা মস্তিষ্কের ভ্রূসন্নিহিত বিভাগে সত্ত্বাদি গুণের আবির্ভাব স্থান। যথা—

> "ভ্রূ-মধ্যে ত্রিদলং চক্রং আজ্ঞাসংজ্ঞং ফলানি তু।
> আবির্ভাবঃ সত্ত্বরজস্তমসাং ক্রমশোমতঃ॥"

ঐ গ্রন্থে মস্তিষ্কের আকার, সন্নিবেশ, বিবিধ বিভাগ ও সে সকলের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য ও ফলাফল বর্ণিত আছে। মস্তিষ্ক মণ্ডলের সেই সকল বিভাগ বা অংশ সংস্কৃত ভাষার পুস্তকে চক্র-সংজ্ঞায় ও পদ্ম-সংজ্ঞায়

উল্লিখিত হয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এতদ্দেশীয় প্রাচীন মুনিঋষিদিগের নির্ণীত জাতিভেদ ব্যবস্থাও প্রকারান্তরে মস্তিষ্ক ঘটিত। সত্ত্বাদিগুণ কি? তাহা এখন ব্যবস্থাপক ঋষিদিগের উপদিষ্ট মনোবৃত্তি সমূহের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে। জগন্মূল সত্ত্বাদি এখন সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবার নহে।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ সত্ত্বাত্তু সাত্ত্বিকাঃ।
আস্তিক্যাঽশুদ্ধধর্ম্মে চ রুচিপ্রভৃতয়ো মতাঃ॥"

আস্তিকী—অস্তি পরলোকাদিরিতি বুদ্ধিঃ। অগুরুঃ শুদ্ধঃ নির্ম্মলোবা ধর্ম্মঃ তত্র রুচিঃ প্রীতিঃ। প্রভৃতি শব্দেন অধর্ম্মান্নিবৃত্তি রুচ্যতে।

সত্ত্বাতু রাজসাৎ ভাবাঃ কামক্রোধ মদাদয়ঃ॥
রাজসাৎ রজঃপ্রধানাৎ সত্ত্বাৎ।
"নিদ্রালস্য প্রমাদানি বঞ্চনাদ্যস্তু তামসাঃ।"
নিদ্রা ইন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবিষয়ব্যাপারোপরমঃ।
আলস্যং ইষ্টসাধনেষ্বপি ব্যাপারেঽপ্রবৃত্তিঃ।
প্রমাদঃ বুদ্ধিকৌশল্যং নিরবধানত্বং বা
বঞ্চনা প্রসিদ্ধা। আদিপদাৎ পৈশুন্য প্রভৃতয়ঃ।
"প্রসন্নেন্দ্রিয়তারোগ্যাঽনলসাদ্যাস্ত সত্ত্বজাঃ।
আরোগ্যং রোগাল্পত্বং। যক্ষকুষ্ঠাদি মহারোগাঽনাক্রান্তত্বমিতি।

শ্লোকগুলির ভাষানুবাদ এইরূপ—

সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ। সত্ত্ব গুণের ধর্ম্মে বা সামর্থে সাত্ত্বিক ভাব, রজোগুণের দ্বারা রাজস ভাব, তথা তমোগুণের প্রভাবে তামস ভাব সকল উৎপন্ন হয়। আস্তিকতা—বিশুদ্ধ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম বিষয়ে নিবৃত্তি, এ সকল ভাব সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বজাত। কাম, ক্রোধ, মদ ও উগ্রতা প্রভৃতি ভাব রজোগ্রস্ত সত্ত্বের প্রভাবে জন্মে। নিদ্রালুতা, অলসতা, প্রমাদ, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বোধ রাহিত্য প্রভৃতি তমোগুণের পরিণামে জন্মে।

ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতা, রোগাল্পতা ও আলস্য শূন্যতা প্রভৃতি দৈহিকভাব গুলিও সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বগুণপ্রভব। সত্ত্বগুণের আধিক্যে দেহের অভ্যন্তর ভাগেরও বৈলক্ষণ্য জন্মে। সে বৈলক্ষণ্য বোধ হয় শ্বেত ডিম্বেরই অল্পাধিক্যঘটিত। "শ্বেত ডিম্ব" নামটি আধুনিক সংকেত-প্রসূত, প্রাচীন নহে। অধুনা কালের ডাক্তারেরা রক্ত পদার্থের বর্ণনায় "শোণ বিন্দু" Red corpuscles 'রস' Serum "শ্বেতবিম্ব" White globules "শ্বেতডিম্বাণু" White globulines, এই সকল নামের উল্লেখ করেন। ঐ সকল ইংরাজি নামের অনুভাষায় ঐ সকল বাঙ্গালা নাম প্রখ্যাত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় ঐ সকল নাম নাই। না থাকিলেও, স্থূলতঃ বুঝা যায় যে, ঋষিরা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে শিরাবাহী আহারীয় রসের মধ্যে শুভ্রতার বিবৃদ্ধি দেখিতে পাইতেন। মহাভারতীয় বনপর্ব্বে একটি গল্প আছে। গল্পটি এইরূপ—

"মঙ্কণক নামা এক ঋষি অন্য এক ঋষিকে নিজ দেহে সত্ত্বাধিক্য দেখাইবার জন্য কুশতৃণের দ্বারা অঙ্গুলি বিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সেই বিদ্ধ স্থান হইতে যে রস নির্গত হইয়াছিল তাহা ভস্মবৎ পদার্থে পরিপূর্ণ।" সুতরাং আমরা বুঝিতে বাধ্য যে, সত্ত্ববিবৃদ্ধিতে রক্তগত শ্বেত ডিম্বের ও শ্বেত-ডিম্বাণুর বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। শাস্ত্রকার মাত্রেই বলিয়াছেন যে, "আহার শুদ্ধ্যা সত্ত্বশুদ্ধিঃ"। মদ্য মাংসাদি ত্যাগী নিরামিষ ভোজী ও পথ্যাশী মনুষ্যের দেহস্থ সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজস্তমোগুণের দ্বারা অনাচ্ছন্ন হয়। শুদ্ধসত্ত্বদেহের কান্তি ও মুখশ্রী অন্যবিধ হয় এবং মনও অন্যাপেক্ষা অনেকটা প্রশান্ত হয়। এ কথা শাস্ত্রলেখক দিগের, আমাদের নহে। আমরা এতাবন্মাত্র দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি যে, নিরামিষভোজী দিগের রক্তে প্রাগুক্ত শ্বেতডিম্বের ও শ্বেত

ডিম্বাণুর ভাগ অধিক। আমার এক বন্ধু এক সময়ে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। এখন তিনি একজন খ্যাতনামা ভাল ডাক্তার। ইনি ছাত্রাবস্থায় মৎস্য মাংসত্যাগী ও হবিষ্যভোজী ছিলেন।

ইনি এক দিন বলিলেন, সাহেবেরা বলে, নিরামিষ ভোজনে শরীরের শোণ বিন্দু কমিয়া যায় এবং শ্বেত-ডিম্বের ভাগ বৃদ্ধি পায়। তুমি নিরামিষ ভোজী, সেজন্য তোমার শরীরস্থ রক্তে শ্বেত-ডিম্বের ভাগ বেশী। এই বলিয়া তিনি তাঁহার ও আমার শরীর হইতে রক্ত বাহির করিলেন এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা নিজের উক্তি সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। ডাক্তার পুরেন্দ্র মোহনের ঐ কথা স্মরণ হওয়ায়, এখন মনে হইতেছে, শুদ্ধসত্ত্ব দেহের রক্তাদি আর রজস্তমোপ্রবল শরীরের রক্তাদি একরূপ ও একধর্ম্মাক্রান্ত নহে। পরন্তু ভিন্ন রূপ ও ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত। যে সময়ে এ দেশে জাতিভেদ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, সে সময়ে অভিহিত প্রকারের গুণভেদকৃত শরীরের ও মনোবৃত্তির প্রভেদ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ অর্থাৎ ম্লেচ্ছ, এই পাঁচ জাতি নির্ণয়ীকৃত হইয়াছিল। ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, জাতিভেদের মূল গুণভেদ, এবং গুণভেদের মূল ভৌম প্রকৃতি। পুরাকালে এ দেশের জল বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতিরই প্রভাবে ঐরূপ বিভিন্ন গুণের ও তদনুযায়ী বিভিন্নজাতীয় মানবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগের সহিত এই আর্য্য-ভূভাগের তুলনা হয় না। অন্যান্য ভূভাগে তিন ঋতু এবং এই ভূভাগে ছয় ঋতু। অন্যান্য ভূভাগে মনুষ্যের বল বর্ণাদি প্রায় এক প্রকারের। এখানে সাদা, কাল, লাল, পীত সকল বর্ণের মানুষ দেখা যায়। অন্যান্য দেশে এরূপ বিচিত্র বর্ণের মানুষ দেখা যায় না। এ দেশে যেমন বিবিধ জাতীয় শস্যাদির ফসল জন্মে, অন্যান্য দেশে এরূপ বিবিধ জাতীয় শস্যাদি জন্মে না। এতদ্দৃষ্টান্তে বুঝা উচিত যে, এ দেশের ভৌম প্রকৃতির প্রভাবেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ, এই পাঁচ জাতি মানব জন্মে। মানুষও শস্যাদির ন্যায় ভূমির ফসল বিশেষ।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

এই শ্লোকের লিখিত নবগুণ অনুসারে প্রথমতঃ এ দেশে কয়েক জন ব্রাহ্মণ কুলীন হইয়াছিলেন। পরে তদ্বংশীয়েরা উক্ত গুণে গুণী হইতেন এবং কুলীন বলিয়া গণ্য মান্য হইতেন। ক্রমে সেই কৌলিন্য বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। বংশগত হওয়ায় অকুলীন অর্থাৎ কোন গুণ না থাকিলেও এখন তদ্বংশীয়েরা কুলীন বলিয়া গণ্য হইতেছেন। এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক আমরা বলিতেছি, আদিম কালের বর্ণভেদ সত্ত্বাদি গুণের অল্পাধিক্য অনুসারেই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। পরন্তু সে ভেদ এখন বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। এখন সেরূপ ব্রাহ্মণত্ব না থাকিলেও, শরীরে সত্ত্বাদি গুণের উৎকর্ষ না থাকিলেও, ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। যদিও ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদের কারণীভূত মূলতত্ত্ব এখন বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত, তথাপি এখনও ব্রাহ্মণজাতীয় দেহের সহিত অন্য জাতীয় দেহের অসমানতা বুঝিবার একটী পরীক্ষা বিদ্যমান আছে। পরীক্ষা এই যে, সকল দেহই দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন হাত, পরন্তু ব্রাহ্মণের দেহ অনধিক অর্দ্ধ অঙ্গুলি বড়।

এই বঙ্গদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরও কায়স্থের কুলস্থান কনোজ ও কুলপুরুষ কনোজিয়া। পরন্তু কালের পরিবর্ত্তন,

ভূমির স্বভাব, জল ও বায়ুর প্রভাব, আহার ব্যবহারের ব্যতিক্রম ও সংসর্গের শক্তিতে ইহারা এখন জাত্যন্তরে পরিণত হইয়াছে। এখন ইহারা বাঙ্গালী জাতি, কনোজিয়া জাতি নহে। আকার প্রকার চালচলন শ্রী সৌষ্ঠব সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন কোন বাঙ্গালী কনোজিয়া মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে পারেন না। দর্শকদিগের দৃষ্টিতে ধরা পড়েন। এখন যদি কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণ, সেই আদিম কালের ব্রাহ্মণ, বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে এ কালের ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে পারিতেন না, দর্শকদিগের দৃষ্টিতে ধরা পড়িতেন। (ক্রমশঃ)

চৈতন্য।

কে জানে সে চেতনা কিরূপ!
প্রকাশিত যাহা মানব জীবনে
এ বিশ্বের মাঝে অতি অপরূপ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ!
যে চেতনা পেয়ে মনুষ্য জীবন,
হয়েছে এমন অমূল্য রতন,
জল স্থল সবে করিয়ে আপন
হেরিতেছে তাহে আপন স্বরূপ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ!
পাইবারে এই দুর্লভ চেতনা,
করেছে জগত অপূর্ব্ব সাধনা,
হইয়ে সফল আজি সে কামনা
উদিয়াছে ভবে এ মানব রূপ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ!
মনুষ্য আবার এ চেতনা পেয়ে
খুঁজিছে তাহার পরম আশ্রয়ে
তার সমাচার এবে নাহি লয়ে
মানব চেতনা হবে না বিমুখ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ!
চৈতন্য সাগরে ডুবিবার তরে,
হেরিতে তাঁহারে পরিপূর্ণাকারে,
বিচিত্র আকারে মানব অন্তরে
হতেছে কতই সাধনা উন্মুখ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ।
মানব জীবনে হইবে যখন,
সব সাধনার শুভ-সম্মিলন,
পরম চেতন রবে না স্বপন,
প্রকাশিত হবে সবার সম্মুখ।
কে জানে এ চেতনা কিরূপ!

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রার্থনা।

এ জগতে মোর আর কিবা আছে বল,
শুধু 'ভালবাসা' তাই জীবনে সম্বল।
সেই ভালবাসা-দীপ পথ দেখাইয়া,
তোমা পানে টানিতেছে এই ক্ষুদ্র হিয়া।
প্রথমেতে বিন্দু বিন্দু বারি ধারা সম,
জাগিয়া উঠিল তাহা এ হৃদয়ে মম।
ক্রমে স্রোত ধারা বয় তটিনী সমান,
দুকূল ভাসায়ে টেনে লয়ে যায় প্রাণ।
তার পর হল প্রাণ ক্ষুব্ধ সিন্ধু প্রায়,
আকুল উচ্ছ্বাসি যেন কোন মুখে ধায়।
শুধু বুক ভরা আহা আকুল কামনা,
কাহারে সর্ব্বস্ব সঁপি হারাতে আপনা।
কোথা কামনার লক্ষ্য কোথা সে আমার,
দয়াময় সে যে তুমি, কেহ নহে আর।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

প্রার্থনা।

জগদীশ কত সুখ লভি এ জীবনে
যদি সব সুখ দুঃখ, সঁপিও চরণে।
যদি মনে স্থির জানি
উপরেতে অন্তর্যামী
তুমি আছ, চেয়ে আছ স্নেহের নয়নে
ঢালিতেছ প্রীতি ধারা স্নেহ প্রেম জ্ঞানে।
প্রতিদিন সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে,
কত অশ্রু ঝরে, লভি ব্যথা হৃদয়েতে,
জাগে কত শত ভয়,
কেন না মঙ্গলময়
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া করি নির্ভর তোমাতে,
দুঃখ ব্যথা সঁপি থাকি স্নেহে ও শান্তিতে।
করজুড়ি অর্পণ যদি বেদনার ভার
পরিশ্রান্ত লভি শান্তি, আনন্দ অপার।
মোর দুঃখ ভার দিয়া,
জুড়ায় তাপিত হিয়া,
জানি মনে দয়াময় তুমি আছ যার,
কি ভয় বিপদ দুঃখ ঝঞ্ঝায় তাহার।

বিশ্বাসেতে পূর্ণ হয়ে কেন না তোমারে,
ডাকি সদা ! কেন সদা হৃদয় মাঝারে
জাগিছে চঞ্চল ভয় ?
এই সারা বিশ্বময়
তোমারি প্রীতিতে ভরা, কুসুমের থরে,
ঝরে প্রীতি, জাগে প্রীতি বিহঙ্গের স্বরে।
এই অবিশ্বাস পূর্ণ আমার হৃদয়
তোমাতে নির্ভর করি হোক তোমাময়।
ওই কুসুমের মত
পালি জীবনের ব্রত
লভি বিহঙ্গের মত কণ্ঠ সুধাময়
গাহি প্রভু তব নাম, গাহি তব জয়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নানা কথা।

মৃত্যু সংবাদ—

বিগত ১৮২২ শকের পবিত্র মাঘোৎসবের দিনে ভারতমাতা সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বিয়োগ সংবাদ আমরা ঘোষণা করিয়াছিলাম। আজ আবার প্রায় দশ বৎসর পরে ভারতসম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃত্যু সংবাদ আমাদিগকে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রদান করিতে হইতেছে। বিপুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, শান্তির প্রতিমূর্ত্তি, উদার হৃদয় মহাপ্রাণ মহারাজা সমস্ত পরিজনের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া, অসংখ্য প্রজাবর্গের রাজভক্তি তুচ্ছ করিয়া বিগত ২৩ এ বৈশাখ রাত্রি এগারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় ভবধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে সমস্ত ভারত আজ শোকসমাচ্ছন্ন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার তুলনায় সত্যসত্যই তিনি অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। তাঁহার পরমায়ু ৬৯ বৎসরের অধিক হয় নাই। সর্দ্দিরোগ ভীষণাকার ধারণ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার প্রাণান্ত ঘটাইল। তিনি সমস্ত রাজসম্পদ পরিহার পূর্ব্বক ললাটের মাণিক্যমণ্ডিত মুকুট অবতারণ করিয়া একাকী সেই বিশ্বভুবনের নিস্তব্ধ মহাসভায় গমন করিলেন। মৃত্যু ত সংসারে যাতায়াত করিতেছে; কিন্তু যখন তাহার বিপুল বিক্রম দুর্গম রাজসিংহাসনের উপর প্রতিফলিত দেখি, তখনি আমরা ভয়ে বিস্ময়ে সন্ত্রস্ত হই। মৃত্যু আজ তাহার প্রচণ্ড প্রতাপ সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিতেছে, এখানকার নশ্বরতা মুক্তকণ্ঠে বিঘোষিত করিতেছে এবং সেই অচঞ্চল ধ্রুব ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছে। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সংসিদ্ধ হইল। তিনি তাঁহার চরণের ছায়াতে আমাদের পিতৃসদৃশ সম্রাটের পরলোকগত আত্মাকে স্থান দিন, তাঁহার শোকসন্তপ্ত মহিষীর অন্তরে সান্ত্বনা বিধান করুন, নব-সম্রাটের অন্তরে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রজাবাৎসল্য প্রেরণ করুন, চরিত্রের বিকাশে অন্তঃস্ফূর্ত্ত রাজভক্তি আকর্ষণ করিবার শক্তি দিন, নবমহিষীর অন্তরে কারুণ্যরস বিতরণ করুন, অসংখ্য প্রজাবর্গের সম্মুখে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মাতৃমূর্ত্তি প্রস্ফুটিত করিয়া দিন, সেই পরম সম্রাটের নিকট আমাদের ন্যায় দীন প্রজার এই কাতর নিবেদন।

প্রার্থনা—বিগত ২৮ এ বৈশাখ বুধবারের উপাসনায় আদি-ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে সম্রাটের পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, অগ্রহায়ণ মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৭১।৴০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩২৩২৸ ৬
সমষ্টি	...	৩৫০৪ ৵৬
ব্যয়	...	৩২৮॥৵৩
স্থিত	...	৩১৭৫॥ ৩

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৫৭৫॥ ৩

৩১৭৫॥ ৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২০০৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যায়
২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১১৵০
পুস্তকালয়	...	২॥৶০
যন্ত্রালয়	...	৫৭॥৶০
সমষ্টি	...	২৭১।৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৮৪।৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২।০
পুস্তকালয়	...	৮।/৩
যন্ত্রালয়	...	৯৮ ৵৯
ব্রাঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৫ ৵৬
সমষ্টি	...	৩২৮॥৵৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৭৭১॥৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩১৭৫॥ ৩
সমষ্টি	...	৩৯৪৭৶৯
ব্যয়	...	৪৫৩৵৩
স্থিত	...	৩৪৯৪/৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
৮৯৪/৬

৩৪৯৪/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	...	২০৪৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত
২০০৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত
২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৲

২০৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩॥০
পুস্তকালয়		১৭৶০
যন্ত্রালয়	...	৫৪৭ ৻৬
সমষ্টি	...	৭৭১॥৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭২।৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২ /৯
পুস্তকালয়	...	।/৬
যন্ত্রালয়	...	২৪৫৶৬
ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট	...	৩৲
সমষ্টি		৪৫৩৵৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

প্রাপ্তি স্বীকার।

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী চন্দ্র
১০০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
২৲
" " সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৲
" " সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৲
" " অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৲
" " যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
১৲

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী
২৲
" সুহাসিনী দেবী
২৲
" নীপময়ী দেবী
১৲
" প্রফুল্লময়ী দেবী
১৲
" চারুবালা দেবী
১৲
" ললিতা দেবী
১৲
" কমলা দেবী
১৲
" অলকা দেবী
১৲
" সুকেশী দেবী
১৲
" ইরাবতী দেবী
১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন
১০৲

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্রাটের মৃত্যু উপলক্ষে উপাসনা।

ভারত সম্রাটের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার পরলোক গত আত্মার কল্যাণ জন্য বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় আদি-ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তিন্ দলের ব্রাহ্মগণ একত্র হইয়া সম্মিলিত ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, বিন্দুমাত্র স্থান ছিল না। কয়েকটি সম্ভ্রান্ত মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য বাবু উদ্বোধন করেন এবং সে দিনের বিশেষ উপাসনার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন। সত্যেন্দ্র বাবুর বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কয়েকটি সময়োপযোগী সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। উহার মধ্যে একটি সঙ্গীতের স্বরলিপি নিম্নে প্রকাশিত হইল। সেদিনের কার্য্য হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

"অদ্য আমরা এক বিপুল শোকের তাড়নে মর্ম্মাহত হইয়া সেই শোকের উচ্ছ্বাসে এই পবিত্র স্থানে সকলে মিলিত হইয়াছি। কিছু দিন পূর্ব্বে কে জানিত যে কাল প্রতীক্ষা করিয়া আছে, অচিরাৎ আমাদের সম্রাটকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। আমরা কোথায় আশা করিতেছিলাম, যে রাজ্যের আসন্ন বিপ্লবে রাজা দুই প্রতিদ্বন্দ্বীদলের মধ্যস্থ হইয়া সকল গোলযোগ মিটাইয়া দিবেন, এমন সময় এক বলবত্তর সম্রাট আসিয়া তাঁহাকে কোথায় অদৃশ্যের মধ্যে লইয়া গেল। সহসা তিনি আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া অমৃত-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনার জন্য এখানে আসিয়াছি। যিনি সমস্ত জগতে শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, আমরা আজ তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার রাজত্বকালে অনেক বিশেষ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে সমালোচনা করিবার সময় ইহা নহে; কিন্তু ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিস্থাপন তিনি তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন,

এবং তাঁহার প্রতিভার প্রভাবে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের মধ্যে সখ্যবন্ধনে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আমরা আশা করি যেন সেই শান্তির বন্ধন কিছুতেই ভাঙ্গিয়া না যায়।

ভারতের প্রতি তাঁহার স্নেহ দৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁহার মাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতবাসীকে স্নেহের চক্ষে অবলোকন করিতেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্র প্রতি অক্ষরে তিনি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ নিজ চক্ষে সন্দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। তখন হইতে ভারতের উপর তাঁহার মমতা অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেই কারণেই তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্র বর্ত্তমান সম্রাটকে ভারতদর্শনে পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও এদেশীয় রাজগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখানে তিনি যে ভাবে কয়েক দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এদেশের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক মমতা ও সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, যাহাতে রাজা প্রজার মধ্যে সহানুভূতি রাজ্যতন্ত্রের মূলমন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়; এই তাঁহার একান্ত কামনা। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি যে বিগত সাম্রাজ্যের ন্যায় আমাদের নবীন সম্রাটের উদীয়মান সাম্রাজ্য সর্ব্বতোভাবে গৌরবান্বিত ও জয়যুক্ত হউক এবং তিনি দীর্ঘ-জীবী হইয়া এই সুবিশাল রাজ্যতরী যথানিয়মে পরিচালন করুন।

সেই রাজেশ্বর যিনি তাঁহার প্রজাবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। তিনি এই মৃত্যুময় সংসারের পরপার সেই পুণ্যধামে শান্তি সুখ উপভোগ করুন। সেই পরলোকগত রাজার যে সুচরিত, তাঁহার ধৈর্য্য বীর্য্য আত্মত্যাগ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা—তাহার স্মৃতি আমরা ধারণ করিতেছি। তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহার সেই পবিত্র স্মৃতি আমাদের অন্তরে চির জাগরূক থাকিবে। তিনি যখন রোগে দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন, জীবন ধারণ তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও তিনি কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিরত হন নাই, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যুর উপরে আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু আমরা মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারি, যদি আমরা জীবনের কর্ত্তব্যের প্রতি বিমুখ না হই। কর্ত্তব্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিতে পারি। পরলোকগত সম্রাট যখন রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন, কত বিঘ্ন বাধা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পরম আরাধ্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আদর্শ অবলম্বন করিয়া সকল কার্য্যে সুদক্ষ ও জয়যুক্ত হইলেন। মাতার নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হইল। তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, পরবর্ত্তী লোকদের জন্য তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গেলেন। শুধু নিজের রাজ্যে নয়, সমস্ত সভ্য জগতে তাঁর কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট পিতার পথ অনুসরণ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, ইহা সামান্য শুভচিহ্ন নহে। সেই পুরাতন সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের সহিত আমাদের স্মৃতির যোগ রহিয়াছে, আর এই নবীন

সম্রাটে আমাদের আশা সমাশ্রিত। তাঁহার উপর আমরা যে আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছি, তিনি আমাদের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইয়া সেই আশা পূর্ণ করুন। যেন তাঁহার পুণ্যব্রত পিতার দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্র শান্তি রক্ষার জন্য প্রহরী রূপে নিযুক্ত থাকেন। অবশেষে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে যিনি সকল শান্তির আলয়, তিনি সকলের অন্তরে শান্তি প্রেরণ করুন। আর যিনি প্রিয়পতির সদ্য বিয়োগে শোকতাপে জরজর, সেই যে কল্যাণময়ী রাজ্ঞী আলেকজাণ্ড্রিয়া, তাঁহাকে আমরা কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব? তাঁহার এই ঘোর দুঃখ-দুর্দ্দিনে মানুষের সান্ত্বনা-বাক্য কি করিতে পারে? সেই সর্ব্বসন্তাপহারী করুণাময়ের নিকট আমাদের কাতর ক্রন্দনে এই নিবেদন যে তিনি পতিবিয়োগ-বিধুরা দুঃখিনী বিধবার অশ্রুজল মুছাইয়া দিন—তাঁহার অন্তরে অজস্র ধারে শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া তাঁহার সকল সন্তাপ দূর করুন, রাজ-পরিবারের সকলের অন্তরে সান্ত্বনা বিধান করুন।

হে ভগবন্! আমাদের কিসে ভাল কিসে মন্দ হয় তাহা আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমার যা' বিধান তাহাই মঙ্গল বিধান, তুমি সুখই দাও দুঃখই দাও, আমরা যেন তোমাতে বিশ্বাস না হারাই। তোমার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা যে পরলোকগত সম্রাটের কল্যাণ কর, যাহারা শোকার্ত্ত তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ কর। আমরা রাজা প্রজা সকলে তোমার সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে তোমার আনন্দ-ধামের উপযুক্ত হইতে পারি, তুমি আমাদিগকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। সকলকেই তোমার কল্যাণ-পথে লইয়া যাও, জোড়করে তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।”

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রভাতী—ঝাঁপতাল।

যাওরে অনন্ত ধামে দেহতাপ পাসরি
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দ-স্রোত চলেছে প্রবাহি॥

যাওরে অনন্ত ধামে, অমৃত নিকেতনে,
শ্রান্তিহর শান্তিময় বিরাম-বিতানে।
দেবঋষি, রাজঋষি, ব্রহ্মঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে একতানে॥

যাওরে অনন্তধামে জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্যকিরণে
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও তুমি, যাও সেই দেব সদনে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II {গা -া। গা গা সা। গা -া। রা সা সা I ন্‌া সা। রা -া গা।
যা ০ ও রে, অ ন ০ ন্ত, ধা মে দে হ তা ০ প

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। রা -পা। মা গা -া I সা -া। রা রা -পা। পা -ধা। পা মা মা I
পা ০ স রি ০ দুঃ ০ খ, আঁ ০ ধা ০ র, যে থা

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I গা গা। রসা রা -গা। মসা -া। -া -া -া} I {রা মা। মা মমা -পা।
কি ছু ই, না ০ হি ০ ০ ০ ০ জ রা না হি০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা পা। পা পা পা I পা -দা। দা দা ণদা। পা -দপা। মা পা -া} I
ম র ণ, না হি শো ০ ক, না হি০ যে ০০ লো কে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I {মা মগা। মা মা -দা। পা -দা। পা মা মপা I মা গা। গা রসা -া।
কে ব০ লি, আ ০ ন ০ ন্দ স্রো ত০ চ লে ছে প্র০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। রগা -মপা। মা -া -া} I {গা -া। গা গা সা। গা -া। রা সা সা I
বা০ ০০ হি ০ ০ যা ০ ও রে অ ন ০ ন্ত ধা মে

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ন্‌া সা। রা গা -মগা। রা -পা। মা গা -া I সা -া। রা পা পা।
অ মৃ ত নি ০০ কে ০ ত নে ০ শ্রা ০ ন্তি হ র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পপা -ধা। পা মা মপা I মা গা। রসা রা -গা। সরা -া। সা -া -া} I
শা০ ০ ন্তি ম য়০ বি রা ম বি ০ তা০ ০ নে ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I {রা -মা। মা মা মমপা। পা -া। পা পা পা I পা -দা। দা দা ণদা।
দে ০ ব ঋ ষি০০ রা ০ জ ঋ ষি ব্র ০ হ্ম ঋ ষি০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা -দপা। মা পা -া} I {মা -গা। মা দা দা। পা -দা। পা মা মপা I
যে ০০ লো কে ০ ধ্যা ০ ন ভ রে গা ০ ন ক রে০

২´ ৩ • ১ ২´ ৩
I গাঃ -ঋঃ। সা ঋগা -মপা। মা -া। -া -া -া} I {গা -া। গা গা সা।
এ • ক তা• •• নে • • • • যা • ও রে অ

• ১ ২´ ৩ • ১
। গা -া। ঋা সা সা I ন্া -সা। ঋা গা মগা। ঋা -পা। মা গা -া I
ন • স্ত ধা মে জ্যো • তি র্ম্ম য়• আ • ন ন্দে •

২´ ৩ • ১ ২´ ৩
I সা -া। ঋা ঋা পা। পা পধা। পা মা মা I গা -া। ঋসা ঋা -গা।
শু • ভ্র সে ই চি র• বি ম ল পু • ণ্য কি •

• ১ ২´ ৩ • ১
। ঋগা -া। ঋসা -া -া} I {ঋা -মা। মা মা মপা। পা -া। পা পা পা I
র • ণে • • যা • য়, যে থা• দা • ন ব ত

২´ ৩ • ১ ২´ ৩
I পা -দা। দা দা ণদা। পা -দপা। মা পা -া} I {মা -গা। মা দা দা।
স • ত্য র ক্ত• পু •• ণ্য বা ন্ যা • ও তু মি

• ১ ২´ ৩ • ১
। পা -দা। পা মা মপা I গা গঋা। সা ঋগা -মপা। মা -া। -া -া -া}II II
যা • ও সে ই• দে ব• স দ• •• নে • • • •

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন।

—•—

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

মঙ্গল।

আপনার প্রতি ও অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য।

(পঞ্চম উপদেশের অনুবৃত্তি)

যে কর্ত্তব্যটি সর্ব্বপ্রধান, যে কর্ত্তব্যটি আর সমস্ত কর্ত্তব্যের উপর আধিপত্য করে, সে কর্ত্তব্যটি কি?—না আপনার প্রভু হইয়া থাকা। দুই প্রকারে আপনার উপর প্রভুত্ব আমরা হারাইতে পারি;—এক কাম ক্রোধ প্রভৃতি উন্মাদনী প্রবৃত্তি সমূহের দ্বারা নীয়মান হইয়া, আর এক—বিষাদ প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া। উভয়ই সমান দুর্ব্বলতা। আমার নিজের উপর ও সমাজের উপর উহাদের কিরূপ কার্য্যফল, তাহা এস্থলে আমি কিছুই বলিতেছি না। উহারা স্বতই মন্দ; কেন না, উহারা মানুষের প্রকৃত গৌরবের উপর আঘাত করে, স্বাধীনতার লাঘব করে, বুদ্ধিকে বিক্ষুব্ধ করে।

অগ্রপশ্চাদ্ বিবেচনা বা পরিণাম-বুদ্ধি—ইহা একটি উচ্চতর সদ্গুণ। আমি সেই সুবিবেচনার কথা বলিতেছি, যাহা সকল কাজেরই মানদণ্ড স্বরূপ, সেই প্রাগ্দৃষ্টি, সেই দূরদৃষ্টি—যাহা বীরত্বনামধারী "গোঁয়ার্ত্তিমি" হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করে; বীরত্বনামধারী এইজন্য বলিতেছি, কেননা, কখন কখন, কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতাও এই নামটি অন্যায়রূপে দখল করিয়া থাকে। বীরত্ব যুক্তির দ্বারা চালিত না হইলেও বীরত্বকে যুক্তিসঙ্গত হওয়া চাই। আমরা সময়ে সময়ে বীর হইতে পারি, কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবনে, সুবিবেচক ও পরিণামদর্শী হইতে পারিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের জীবনের রাশরজ্জু আমাদের হাতে থাকা চাই, উপেক্ষা কিংবা গোঁয়ার্ত্তিমির দ্বারা আমরা যেন অনর্থক বাধা বিঘ্ন প্রস্তুত না করি, অনর্থক নূতন বিপদের সৃষ্টি না করি। অবশ্য, সাহসী হওয়া প্রার্থনীয়, কিন্তু এই পরিণামদর্শিতাই—সাহসের মূলতত্ত্ব না হউক, সাহসের একটা নিয়ম; কেননা, প্রকৃত সাহস একটা অন্ধ আবেগ মাত্র নহে; ইহা মুখ্যত ধীরতা,—বিপদকালে বিচলিত না হওয়া, আপনার উপর দখল হারাইয়া না ফেলা। এই পরিণামবুদ্ধি, মিতাচারিতা সম্বন্ধেও শিক্ষা দেয়; ইহা আমাদের আত্মার সেই সাম্যভাব রক্ষা করে, যাহার অভাবে আমরা ন্যায়কে ঠিক্ চিনিতে পারি না, ন্যায়বুদ্ধি অনুসারে কাজ করিতে পারি না। পুরাকালের লোকেরা এই জন্যই পরিণামদর্শিতাকে সকল সদ্গুণের জননী ও রক্ষক বলিতেন। এই পরিণামবুদ্ধি, সুবিবেচনার দ্বারা স্বাধীন ইচ্ছাকে পরিশাসন করা ভিন্ন আর কিছুই নহে; আবার যে স্বাধীনতা বুদ্ধিবিবেচনার হাত-ছাড়া হয়, তাহাই অবিমৃষ্যকারিতার নামান্তর; একদিকে, সুশৃঙ্খলা, আমাদের মনোবৃত্তির পরস্পরের মধ্যে উচ্চনীচতা-অনুসারে ন্যায্য অধীনতা সংস্থাপন; অন্য দিকে উচ্ছৃঙ্খলতা, অরাজকতা ও বিদ্রোহিতা।

সত্যবাদিতা আর একটি মহদ্গুণ। সত্যের সহিত মনুষ্যের যে একটা স্বাভাবিক বন্ধন আছে, মিথ্যাবাদিতা সেই বন্ধন ছেদন করিয়া মনুষ্যের গৌরব নষ্ট করে। এই জন্যই মিথ্যা কথনের ন্যায় গুরুতর অপমান আর নাই এবং এই জন্যই অকপটতা ও ঋজুতা এত সম্মানিত হইয়া থাকে।

আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষের

যাহা সাধন-যন্ত্র সেই সাধন যন্ত্রকে আঘাত করিলে, স্বয়ং নৈতিক পুরুষটিকেই আঘাত করা হয়। এই অধিকারসূত্রেই, স্বকীয় শরীরের প্রতি মানুষের কতকগুলি অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য আছে। এই শরীর আমাদের একটা বাধাও হইতে পারে, একটা সাধনোপায়ও হইতে পারে। যাহার দ্বারা শরীর রক্ষা হয়, শরীরের বলাধান হয়, তাহা যদি শরীরকে না দেওয়া হয়, যদি শরীরকে অতিমাত্র উত্তেজিত করিয়া, তাহা হইতে অধিক কাজ আদায় করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে শরীর অবসন্ন হইবে, শরীরের অপব্যবহারে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। আবার যদি শরীরকে বেশী প্রশ্রয় দেও, যদি তাহার সমস্ত উদ্দাম বাসনাকে চরিতার্থ করিতে দেও, যদি তুমি শরীরের দাস হইয়া পড়—সে আরও খারাপ। যে শরীর আসলে আত্মার দাস সেই শরীরকে যদি দুর্ব্বল করিয়া ফেল, তাহা হইলে আত্মারই হানি করা হইবে ; আরও হানি করা হইবে যদি আত্মাকে শরীরের দাস করিয়া ফেল।

কিন্তু আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষটিকে সম্মান করিলেই যথেষ্ট হইবে না, উহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। ঈশ্বরের নিকট হইতে যেমনটি পাইয়াছি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়া আমাদের আত্মাকে ঈশ্বরের হাতে যাহাতে প্রত্যর্পণ করিতে পারি,তৎপ্রতি আমাদের বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। আবার নিত্য সাধনা ব্যতীত এই বিষয়ে সুসিদ্ধ হওয়াও সুকঠিন। প্রকৃতিরাজ্যে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, নিকৃষ্ট জাবেরা, ইচ্ছা না করিয়া, ও না বুঝিয়া, বিনাচেষ্টাতেই স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট বিকাশ লাভ করে। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে অন্যরূপ নিয়ম। মানুষের ইচ্ছাশক্তি যদি নিদ্রিত হয়, তাহা হইলে তাহার অন্য মনোবৃত্তিসমূহ অবসাদগ্রস্ত ও জড়তাগ্রস্ত হইয়া কলুষিত হইয়া পড়ে ; তখন উদ্দাম অন্ধ আবেগের দ্বারা চালিত হইয়া, ঐ সকল মনোবৃত্তি অপথে গমন করে। ফলত আপনার দ্বারা শাসিত হইয়াই, শিক্ষিত হইয়াই, মানুষ বড় হইয়াছে।

সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া মানুষের ব্যাপৃত থাকা আবশ্যক। ফলত একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই সত্য ও মঙ্গলকে স্পষ্টরূপে দেখিতে আমাদিগকে সমর্থ করে, এবং একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই স্বাধীনতাকে স্বকীয় প্রযত্নের ন্যায্য বিষয় প্রদর্শন করিয়া তাহাকে যথাপথে চালিত করে। বুদ্ধিবৃত্তি মনকে সর্ব্বদাই কোন প্রকার কাজে নিযুক্ত রাখে, শরীরের ন্যায় মনকেও সুদৃঢ় করে, নিদ্রালু হইলে তাহাকে জাগাইয়া তুলে ; যখন দুষ্ট অশ্বের ন্যায় রাশরজ্জু না মানিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, তখন তাহাকে ধরিয়া রাখে, এবং তাহার নিকট নূতন নূতন বিষয় আনিয়া উপস্থিত করে। কেননা, মনকে সর্ব্বদাই বিবিধ সম্পদে বিভূষিত করিতে পারিলেই মনের দৈন্য নিবারিত হয়। আলস্য মনকে অসাড় ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। সুনিয়মিত কাজ মনকে উত্তেজিত করে, সুদৃঢ় করে, এবং এইরূপ কাজ করা আমাদের সকলেরই সাধ্যায়ত্ত।

আমাদের অন্যান্য মনোবৃত্তির ন্যায় স্বাধীনতারও একটা শিক্ষা আছে। কখন শরীরকে দমন করিয়া, কখন স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে শাসন করিয়া, বিশেষত প্রবৃত্তিসমূহের আবেগকে প্রতিরোধ করিয়া আমরা স্বাধীন হইতে শিক্ষা করি। বাধাবিঘ্নের সহিত প্রতিপদে আমাদিগের সংগ্রাম করিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন

করিলে চলিবে না। এইরূপ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিয়াই আমরা স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হই।

এমন কি, আমাদের ভাববৃত্তিরও একটা শিক্ষা আছে। ভাগ্যবান তাহারা যাহাদের হৃদয়ে জ্বলন্ত উৎসাহরূপ স্বর্গীয় অগ্নি স্বভাবতই বিদ্যমান। ইহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করা তাহাদিগের কর্ত্তব্য। এমন কোন আত্মা নাই যার অন্তরের প্রচ্ছন্ন স্তরে কোন একটা উচ্চভাব খনি সঞ্চিত নাই। ইহাকে আবিষ্কার করা চাই, অনুসরণ করা চাই, এই পথে যদি কোন বাধা থাকে তাহাকে অপসারিত করা চাই, যদি কোন অনুকূল জিনিস থাকে, তাহার অনুসন্ধান করা চাই, এবং অবিশ্রান্ত যত্নের দ্বারা তাহা হইতে অল্পে অল্পে রত্ন উদ্ধার করা চাই। যদি কোন একটা বিশেষ উচ্চভাব তাহার না থাকে, অন্তত যে উচ্চভাবের অঙ্কুর তাহার অন্তরে স্বভাবত আছে, তাহারই পুষ্টিসাধন করা আবশ্যক। সেই ভাবের স্রোতে সময়ে সময়ে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, এমন কি বুদ্ধিবৃত্তিকেও তাহার সাহায্যার্থে আহ্বান করিতে হইবে; কেননা সত্য ও মঙ্গলকে যতই জানা যায়, ততই তাহাকে না ভালবাসিয়া থাকা যায় না। এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তি,আমাদের ভাববৃত্তি হইতে যাহা কিছু ধার করে, পরে তাহা সুদসমেত ফিরিয়া পায়। মহৎভাব সমূহে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি, জল্পী দার্শনিকদিগের বিরুদ্ধে আপনার অন্তরে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়।

অন্যের সহিত সংশ্রব যদি রহিতও হয়, তবু মানুষের কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকে। যতক্ষণ তাহার কতকটা বুদ্ধি থাকে, কতকটা স্বাধীনতা থাকে,ততক্ষণ তাহার অন্তরে মঙ্গলের ধারণা ও সেই সঙ্গে কর্ত্তব্যের ধারণাও বিদ্যমান থাকে। যদি আমরা কোন মরুদ্বীপে নিক্ষিপ্ত হই, সেখানেও কর্ত্তব্য আমাদিগকে অনুসরণ করিবে। স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বাধীনতার প্রতি কোন বুদ্ধিমান ও স্বাধীন জীবের যে কর্ত্তব্য আছে,—কতকগুলি বাহ্য অবস্থা, সেই কর্ত্তব্য হইতে তাহাকে অব্যাহতি দিবে,—এ একটা অসঙ্গত কথা। কোন গভীর বিজনতার মধ্যে থাকিয়াও, সে অনুভব করে,—সে একটা নিয়মের অধীন, তাহার উপরে সেই নিয়মের তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি সতত নিপতিত রহিয়াছে। ইহা তাহার পক্ষে যেমন একটা বিষম যন্ত্রণা তেমনি আবার গৌরবের বিষয়।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বপ্রেম।

ব্রাহ্ম-সমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে অপৌত্তলিক অংশ পরিবর্জ্জন করিয়া প্রচলিত হিন্দু গৃহ্য-অনুষ্ঠানের প্রায় তাবৎই রক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ অনুষ্ঠান-পদ্ধতির যিনি সংগ্রহকার, তিনি সত্যের অবিরোধী সর্ব্বাঙ্গীন হিন্দুভাব যাহাতে রক্ষা পায়, তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই। উভয়বিধ অনুষ্ঠান যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি আমাদের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। যাহাতে অনুষ্ঠানের প্রকৃত অর্থ সর্ব্বসাধারণের হৃদ্গত হয়,দায়িত্বভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, এ কারণে উপদেশগুলী ভাষায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রতি অনুষ্ঠানের উপসংহারভাগে এরূপে উপদেশের যে বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহা চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এরূপ উপদেশ দানের নবীনত্ব অনেকের চক্ষে আপত্তিকর ঠেকিতে পারে,

কিন্তু তাঁহাদের নিকট আমাদের নিবেদন এই ঠিক একই পদ্ধতি চিরকাল সমানভাবে চলিতে পারে না, সময় ও অবস্থা অনুসারে তাহার তারতম্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। গৃহ্য-সূত্রে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমানকালের ভবদেব-পদ্ধতি তাহা হইতে অনেকটা পৃথক।

নিম্ন বঙ্গে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান যে পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, গয়াতে তাহা হইতে কতকটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ পিণ্ডদানের পক্ষপাতী না হইলেও পরলোকগত পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে এবং তাঁহাদের প্রীতি উদ্দেশে দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদাসীন নহেন। ব্রাহ্মসমাজ এ সত্য জলন্ত ভাষায় সর্ব্বসময়ে ঘোষণা করিতে প্রস্তুত, যে পরলোকগত পিতৃলোকের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রধানতম সহায়। এই পিতৃপূজার মর্য্যাদা এদেশে এতই প্রতীত হইয়াছিল যে অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ এ সকলেরই প্রারম্ভে পিতৃলোকের অর্চ্চনা ও আবাহন হইত; এমনকি দেবদেবী পূজার পূর্ব্বে নিত্য উপাসনার ভিতরে পারিবারিক মাঙ্গলিক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের ভিতরে পিতৃপূজার অল্পাধিক ব্যবস্থা ছিল ও আছে। হিন্দুজাতির সাত্ত্বিক প্রকৃতির মূলে যে সকল কারণ অনৈতিহাসিক কাল হইতে কার্য্য করিতেছে, আমরা যদি বিরলে তাহার পরিচয় পাইতে চাই, সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাইব পিতৃপূজা ও তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান। যাহাদের পিতা নাই, মাতা নাই, আপনার বলিবার কেহ নাই, তাহাদের সকলের আত্মা সুতৃপ্ত হউক, এইত মন্ত্র। জানি না হৃদয়কে কতদূর উদার ও বিশ্বপ্রেমিক করিতে পারিলে, স্বার্থপরতার রাজ্য হইতে কত উচ্চে উঠিতে পারিলে আমাদের দুর্ব্বল কণ্ঠ হইতে একথা সহজে বিনির্গত হইতে পারে। গয়াশ্রাদ্ধে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়; তাহা পিতৃষোড়শী ও মাতৃষোড়শী নামে আখ্যাত। আমরা মাতৃষোড়শীর প্রথম চরণ গুলিই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, প্রতি দ্বিতীয় চরণে "তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং" এইরূপ আছে।

গর্ভস্থাগমে চৈব বিষমে ভূমিবর্ত্মনি। ১
মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ। ২
শৈথিল্যে প্রসবে চৈব মাতুরত্যন্ত দুষ্করং। ৩
পদ্ভ্যাং জনয়তে মাতুর্দুঃখঞ্চৈব সুদুস্তরং। ৪
অগ্নিনা শোষয়েতে দেহং ত্রিরাত্রানশনেষু চ। ৫
পিবেচ্চ কদ্রব্যাণি ক্লেশানি বিবিধানি চ। ৬
দুর্লভং ভক্ষ্যদ্রব্যাস্য ত্যাগে বিন্দতি যৎফলং। ৭
রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং। ৮
পুত্রং ব্যাধি সমাযুক্তং মাতৃ দুঃখমহর্নিশং। ৯
যদা পুত্রো ন লভতে তদা মাতুশ্চ শোচনং। ১০
ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভরং স্তনং। ১১
দিবারাত্রৌ যদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ পুনঃ। ১২
পূর্ণেতু দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করং। ১৩
গাত্রভঙ্গো ভবেন্মাতুস্তুষ্টিং নৈব প্রযচ্ছতি। ১৪
অন্নাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোস্তি বালকঃ। ১৫
যমদ্বারে মহাঘোরে পথিমাতুশ্চ শোচনং। ১৬
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং।

ইহার ভাষা সরল, অনুবাদ প্রদান করা বাহুল্য মাত্র।

ঊনবিংশতি-পিণ্ডদান-ক্রিয়ার মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"যাহারা মাতামহ-কুলে বা বন্ধুবর্গ-কুলে জন্মিয়াছেন, যাহাদের কোন গতি নাই, যাহারা অজাতদন্ত অথবা গর্ব্তে প্রপীড়িত, যাহারা অগ্নিদগ্ধ বা তাহার বিপরীত, যাহারা বিদ্যুতহত বা চৌরহত, যাহারা দাবদাহে মৃত অথবা সিংহব্যাঘ্রহত, যাহারা দন্তী বা শৃঙ্গীর আঘাতে মৃত, যাহারা উদ্বন্ধনে বিষ বা শস্ত্র প্রয়োগে হত, যাহারা আত্মঘাতী, যাহারা

অরণ্যে বা পথে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় হত, যাহারা ভূত প্রেত পিশাচ, যাহারা অন্ধকারময় রৌরবে কালসূত্রে অবস্থিত, অনেক যাতনাময় প্রেতলোকে যাহারা গত, যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক যাহারা নীত হইয়া যাতনাময় নরকে অবস্থিত, যাহারা পশুযোনিগত, পক্ষী কীট ও সরীসৃপ ও বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত, যাহারা স্বীয় কর্ম্মে বিবিধ যোনি ভ্রমণ করিতেছে, যাহাদের মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, দিব্যলোকে অন্তরীক্ষে বা এখানে যে সকল পিতৃগণ ও বান্ধবেরা অবস্থিতি করিতেছেন, যাহারা মৃত হইয়া অসংস্কৃত অবস্থায় রহিয়াছেন বা প্রেতরূপে অবস্থান করিতেছেন, "তে সর্ব্বে তৃপ্তিং আয়ান্তু" তাঁহারা সকলে সুতৃপ্ত হউন। যাহারা আমাদের আবান্ধব বা বান্ধব বা পূর্ব্বজন্মে বান্ধব ছিলেন, যাহারা পিতৃকুলে মাতৃবংশে গুরু শ্বশুর ও বন্ধুকুলে মৃত হইয়াছেন, যাহারা আমার কুলে পুত্রদারাবিবর্জ্জিত হইয়া লুপ্তপিণ্ড হইয়াছেন, যাহাদের ক্রিয়া লোপ পাইয়াছে, যাহারা জন্মান্ধ পঙ্গু বিরূপ আমগর্ভ, যাহাদের সকলকে আমি জানি বা জানি না, যাঁহারা আমার পিতৃ ও মাতৃবংশে অতি পূরাকালে জন্মিয়াছিলেন, যাহারা এই উভয় কুলে দাস ভৃত্য আশ্রিত ও সেবক, যাহারা মিত্র, সখা, পশু, বৃক্ষ, যাহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমার উপকার করিয়াছে, যাহারা পূর্ব্বজন্মে আমার দাস ছিলেন, তাহাদের সকলের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতেছি। কি উদারতা, বিশ্বপ্রেমের কি সুন্দর নিদর্শন।*

হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়া আমরা ঈশ্বরের পূজা করি। আমাদের পিতৃপূজার উপকরণও তাহাই। ঈশ্বরের পূজার যেমন দুইটি অঙ্গ এক তাঁহাকে প্রীতি করা আর এক তাঁহার প্রিয় আদেশ পালন করা, পিতৃপূজার অঙ্গও ঠিক তাই ; এক তাঁহাদের উদ্দেশে প্রীতিকৃতজ্ঞতা উদ্দীপিত করা, অন্য তাঁহাদের বৈধ আদেশ পালন করা। ঈশ্বরের যদি আমরা প্রকৃত ভক্ত উপাসক হইতে চাই, তবে পিতা মাতা বা গুরুজন, তাঁহারা ইহলোকেই থাকুন আর পরলোকেই থাকুন, তাঁহাদের প্রতি যেন প্রীতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত না হই। শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার ভাবকে এইরূপে অনুশীলিত করিয়া তাহাকে পরিবর্দ্ধিত ও সুমার্জ্জিত করিতে পারিলে তবে তাহা ঈশ্বরের গ্রাহ্য হয়, এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁহার উপাসনা করিবার আমাদের অধিকার জন্মে। এইত গেল পরলোকগত আত্মার দিকে। আবার অন্যদিকে এই যে পিতৃলোকের সহিত ভক্তি-যোগে এই যে সখ্য-বন্ধন, তাঁহাদের অনুগত ও আশ্রিত লোকের সহিত এই যে

* আমরা এখানে ইহাও বলিতে চাই যে অন্যান্য জীবের সহিত, হীনজাতীয় মনুষ্যের সহিত, এমন কি সামান্য কীট পতঙ্গের সহিত সখ্যভাব স্থাপন এদেশের অপরিজ্ঞাত ছিল না। আমরা আজ কালকার দিনে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর সকল জাতির সহিত সাম্যভাবের মীমাংসা যে ভাবে করিতে উদ্যত, ঠিক সেই ভাবের কোন চেষ্টা এদেশে পূর্ব্বে ছিল না বটে, কিন্তু প্রাচীন ঋষিদিগের প্রচারিত সাম্যভাব মহত্তর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা সকল মনুষ্যের ভিতরে—সকল প্রাণীর ভিতরে—সকল কীট পতঙ্গের ভিতরে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিতেন। "চণ্ডালে গবি হস্তিনি" এ সকলের মধ্যে ব্রহ্মসত্তা সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে আর ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেন না, সকলের সঙ্গে মৈত্রী যোগে আবদ্ধ হইতেন। অবশ্য তাঁহাদের প্রদত্ত এ শিক্ষা জনসমাজ ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা। ফলতঃ তাঁহাদের শিক্ষা প্রভাবে বিশেষতঃ বৌদ্ধযুগে এই সাম্যমন্ত্রে সকলে দীক্ষিত হইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বুদ্ধ দেবের শিক্ষা তাঁহার ধর্ম্মের ভাব সাম্যবাদ মৈত্রী ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভাগবতের শিক্ষাও কতকটা এই ভাবের। ফলতঃ যে ধর্ম্ম বিশ্বপ্রেমকে জাগাইয়া তুলিতে না পারে, সকলের সহিত মৈত্রী বন্ধন শিক্ষা না দেয়, অহিংসার ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, তাহা একভাবে বলিতে গেলে অপূর্ণ ধর্ম্ম, তাহা কোন দেশের এবং কোন কালেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

মৈত্রীভাব, পশু পক্ষী জীবাণু এ সকলেরই কল্যাণের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই যে বিশ্বব্যাপী প্রেমের অভিব্যক্তি," অথবা বিশ্বব্যাপী বলি কেন, ইহলোক পরলোক দিগদিগন্ত কালাকাল প্রসারিত এই যে নিষ্কাম প্রীতির ভাব, আত্মীয় অনাত্মীয় শত্রু মিত্র, এ সকলের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গ সাধন, স্বার্থপূর্ণ মর্ত্তে স্বর্গীয় এই যে দেবভাবের অভিনয়, বিরাট হৃদয়ের এই যে অপূর্ব্ব প্রার্থনা, ইহার মধুময় ফলে যদি আত্মার অসাড়তা বিদূরিত না হয়, বসন্তের প্রাণদ সমীরণ যদি সে স্থানকে স্পর্শ না করে, তবে জানি না আত্মার কল্যাণ আর কিরূপে সমধিক সাধিত হইতে পারে।

তোমার পথে।

দেখতে দেখতে হল সে যে
অনেক দিনের কথা।
দেখেছিলে আমায় যে দিন
ফিরতে যথা তথা।
ভুলতে ছিনু ঘরের কোণে
ধুলো মাটির রাশ।
দিন দুপুরে দিতেছিনু
শুক্‌নো ভূঁয়ে চাষ্।
দেখেছিলে ব্যর্থ কাজে
করতে আনা গোনা।
সেই পথেতে, সে পথ আমার
নয় কো জানা শোনা।
তুমি যে দিন ঘরে আমার
দিলে আসি দেখা,
চিনিয়ে আমায় দিলে তোমার
সরল পথের রেখা,
সে দিন হতে তোমার পথে
করছি আসা যাওয়া,
লাগছে আমার গায়ে যেন
খোলা মাঠের হাওয়া।
মুক্ত হাওয়ায় চোখে আমার
পড়ে গেছে ধরা।
আমায় যেটা ছড়িয়ে আছে
তোমায় সেটা ভরা।

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রার্থনা।

দয়াময় সৃজিলেন আকাশ ধরণী,
তাঁরি দয়া লয়ে আসে দিবস রজনী,
ছড়ায়ে আলোক ধারা। দিবস আসিয়া
সজীব চেতন করি দেয় ক্ষুদ্র হিয়া।
সন্ধ্যালোকে আসে নিশি লয়ে সন্ধ্যা তারা,
শ্রান্ত ধরণীরে ঢালি সুধা শান্তি ধারা।
নিশীথে প্রহরী সম কে সদা জাগিয়া,
দয়াময় পিতা তিনি জুড়াইতে হিয়া।
থাক সাথে দয়াময় নিশীথে দিবসে,
যেন শক্তি লভি দেব তোমার পরশে।
ভয় বা ভাবনা রাশি ব্যথিত করিয়া,
যেন না বিকল করে এই ক্ষুদ্র হিয়া।
কখনো ভোলোনা মোরে জগৎ-জীবন
সর্ব্ব কাজে লভি যেন তোমার শরণ।

প্রার্থনা।

জাগরে অবশ প্রাণ, তরুণ তপন
ধরারে চেতন দিল, তুমি অচেতন
থেকোনাক, দূর কর অলস বিলাস
আনন্দ স্বরূপে প্রাণে করহ প্রকাশ।
যা গেছে তা যাক্ চলে, এখনো নয়ন
রয়েছে সম্মুখে পড়ি, তুমি সমুদয়
নবীন উৎসাহ লয়ে হও অগ্রসর,
তাঁরে স্মর, যাঁর পূজা করে চরাচর।
সদা সত্য-ব্রত তুমি করহ পালন,
বিবেকের হাত ধরি করিও গমন।
নির্ম্মল গগন সম পবিত্র উদার,
হউক সর্ব্বদা এই জীবন আমার।
অনন্ত মহান সেই পরম ঈশ্বরে,
সদা পূজিবারে যেন পারি ভক্তিভরে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

জন্ম স্থিতি বা মৃত্যু একই শক্তির বিকাশ।

শক্তি জ্ঞানেরই বিকাশ, সুতরাং শক্তি নাই, জ্ঞানই নিত্য বা সত্য।

ক্রমশঃ পিতা মাতা, পুত্র কলত্র, পৌত্র কন্যা, দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতির বিয়োগ হেতু কাতর হইয়াছি। বাস্তবিক কাতরতার একবারেই কোন কারণ আছে কিনা দেখা আবশ্যক। পিতা মাতা পুত্র কলত্র প্রভৃতির দেহের অভাব বা দেহ অদৃষ্ট হইয়াছে। দেহ পরিবর্ত্তনশীল। দেহ থাকে এবং পরে তাহার ধ্বংস হয়। পদার্থ মাত্রই এই নিয়মাধীন। তাহারা জন্ম স্থিতি এবং মরণ ধর্ম্মশীল। অতএব মরণ ধর্ম্মশীল দেহের মরণ বা ধ্বংস হইল বলিয়া ক্ষোভের কারণ নাই। পদার্থময় জগৎ ধ্বংসশীল বা পরিবর্ত্তনশীল। জ্ঞান স্থির থাকিলে এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয় না এবং জ্ঞান অস্থির হইলেই পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য হয়। আমার স্থির জ্ঞান না থাকা হেতু জগতের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করতঃ বিচলিত হই এবং ক্ষুব্ধ হইয়া থাকি। বাস্তবিক যে নিজে অস্থির, তাহার পক্ষে স্থির জ্ঞান সম্ভব নহে। তাহার জ্ঞানে সদা অস্থিরতা। আমি স্বয়ং অস্থির-জ্ঞান হইয়া কি প্রকারে শান্তি পাইব? আমার স্থির জ্ঞান থাকিলে জগতের পরিবর্ত্তনে মনোনিবেশ হয় না; সুতরাং ক্ষোভের কোন কারণ হয় না। আমার স্থির জ্ঞানের অভাব হেতু জগতের অস্থির ভাবই মনে করি। জগতের পরিবর্ত্তন-ভাব সন্দর্শনে বিচলিত এবং ক্ষুব্ধ হই। এবং সেই ভাব অসহ্য হওয়ার জগতের অপরিবর্ত্তনীয়তার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বলবতী হয়। আমার স্থির জ্ঞান থাকিলে জগতের পরিবর্ত্তনে আমার শান্তির অভাব হয় না। স্থির জ্ঞান থাকিলে আমি স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই যে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছে। পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার জন্য আবার ক্ষোভ কি? এই ভাব আমার স্থির-জ্ঞানের পরিচায়ক। অর্থাৎ এইরূপ ভাব হইতে বুঝিতে হইবে যে আমার স্থির বা ঠিক জ্ঞান হইয়াছে। তখন সহজেই বুঝিব অস্থির ভাবে ভ্রান্তি এবং স্থির ভাবে সত্য। তখন পদার্থের তারতম্য জ্ঞান থাকিবে না। দেখিব এক অসীম বল বা শক্তি সমভাবে সৃষ্টি স্থিতি এবং ক্ষয়কে পরিচালিত করিতেছে। সৃষ্টি স্থিতি এবং ক্ষয় একই শক্তির বিকাশ মাত্র। এই তিনে একই কার্য্য সাধন করে। একই ভাব প্রকাশ করে। তাহারা তিন পৃথক্ পৃথ নামে অভিহিত হইলেও অভিন্ন। সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় অথবা জন্ম অবস্থান এবং মরণ এই প্রত্যেকের যখন একই কারণ শক্তি এবং যখন প্রত্যেকটিই একই শক্তিরই বিকাশ, তখন আর প্রত্যেকের পার্থক্য অনুমান করা যাইতে পারে না। জন্ম, স্থিতি, মৃত্যু একই। তাহারা শক্তির নামান্তর মাত্র। শক্তিই আদি কারণ। শক্তি আবার জ্ঞানাশ্রিত বা জ্ঞানাপেক্ষী। জ্ঞানের প্রকাশই শক্তি। সুতরাং জ্ঞান শক্তির অব্যবহিত হেতু! জ্ঞানই মূল। এক্ষণে প্রতীতি হইবে, আমার অস্থির ভাব হেতুই যত অনর্থপাত। অস্থির ভাব না থাকিলে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে বিচলিত হই না। আমি স্থির থাকিলে আমার নিকট সমুদায়ই স্থিররূপে প্রতীয়মান হয়। জগতের পরিবর্ত্তনে অস্থিরতার লেশমাত্র উপলব্ধি করি না। তখন সৎ বা নিত্য জ্ঞানাপেক্ষী স্থির-শক্তি-সম্ভূত পরিবর্ত্তনই মনে করি না। পরিবর্ত্তনের কারণ শক্তিকে স্থির জানিয়া তন্মূলক পরিবর্ত্তনে স্থিরতাই উপলব্ধি করি। তখন একই সমভাবাপন্ন শক্তি ভিন্ন আর কোন কিছুরই ধারণা হয় না। সেই শক্তি আবার নিত্য জ্ঞানকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞানেরই অনুভব হয়। তাহা হইলে আর ক্ষুদ্র দেহের অবস্থান্তর বা রূপান্তর হেতু মুগ্ধ হই না, ক্ষুব্ধ হই না। যে শক্তি প্রসাদাৎ জন্ম এবং স্থিতি, সেই একমাত্র শক্তি প্রসাদাৎই মৃত্যু জানিয়া স্থির থাকি। দেহান্তর হেতু শক্তির অবসান হইল বলিয়া ভ্রম হয় না। পূর্ব্বাপর একই শক্তির ক্রিয়া দেখি। আর জ্ঞানকে আশ্রয় বা অপেক্ষা পূর্ব্বক শক্তির ক্রিয়া হওয়া হেতু জ্ঞানই মাত্র অনুভূত হয়। "জ্ঞানমানন্দম্ ব্রহ্ম" অর্থাৎ জ্ঞান আনন্দ এবং ব্রহ্ম। ইহা বেদান্তবাক্য। জ্ঞান নিত্য এবং মঙ্গলময় এবং মঙ্গলই বুঝিতে হইবে। যখন জ্ঞানেরই সত্তা বা বিদ্যমানতা এবং জ্ঞানকে অপেক্ষা বা আশ্রয় করিয়া জগৎ, অথবা জ্ঞান হেতু জগৎ, তখন জগতের আর পৃথক সত্তা সম্ভবে না। আমাকে লইয়া জগৎ, সুতরাং আমার আর পৃথক সত্তা নাই। আমিও জ্ঞান ব্যতীত নহি। আমি অথবা জগৎ সেই জ্ঞান। পদার্থ মাত্রই সেই জ্ঞান ব্যতীত নহে। জন্ম স্থিতি লয় পদার্থের ধর্ম্ম। আর জন্ম স্থিতি লয় একই শক্তির অধীন। একই শক্তি কর্ত্তৃক সমভাবে পরিচালিত, অতএব শক্তিই তাহাদের হেতু। সেই শক্তি আবার জ্ঞান সাপেক্ষ, জ্ঞান ব্যতীত শক্তির সত্তা অসম্ভব। জ্ঞান হইতেই শক্তি। জ্ঞান কিন্তু শক্তি-নিরপেক্ষ অর্থাৎ শক্তিকে অপেক্ষা করে না; এবং অনাদি বা স্বপ্রকাশ। পঞ্চদশীতে উল্লেখ আছে "কিং মানমিতি ! চেন্নাস্তি মানাকাংক্ষা স্বয়ংপ্রভে।"

অর্থাৎ জ্ঞানব্রহ্মের প্রমাণ আর কিছুই নাই, ইহা নিত্য জ্ঞানময় এবং নিজ হইতে প্রকাশিত। ইহাতেই প্রতীয়মান হইবে, জ্ঞান ব্যতীত কিছু নিত্য নহে, বা কিছুই নাই। আমার অস্তিত্ব জ্ঞানেতেই যাহাকে সাধারণতঃ 'আমি' বলিয়া থাকি, তাহার ক্রিয়া আছে। সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তন এবং তদ্ধেতু ক্ষোভাদিও আছে। কিন্তু পূর্ব্ব নির্দ্দেশিত 'জ্ঞান-আমির' ক্রিয়া নাই বা ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তন এবং তদ্ধেতু ক্ষোভাদি নাই। জ্ঞান একই। জ্ঞান পৃথক পৃথক নহে। সুতরাং জ্ঞান-আমি বা আমি পৃথক নহি। সমুদায়ই এক আমি বা এক জ্ঞান। অতএব আমার জন্ত বা আমার অভাবে আমার ক্ষোভ, অথবা জ্ঞানের জন্ত বা জ্ঞানের অভাবে জ্ঞানের ক্ষোভ বাতুলতা মাত্র।

"প্রয়োজন বলিয়া কিছুই নাই।"

প্রয়োজনীয়তার বিশ্বাসই ক্ষোভ, দুঃখের হেতু; কিন্তু প্রয়োজন বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং আমারও প্রয়োজন নাই। বরং আমার প্রয়োজন না থাকাই আমার প্রয়োজন। কারণ তাহা হইলে, প্রয়োজন জড়িত দুঃখ পাই না। অন্নের প্রয়োজন বলিয়া তদন্বেষণে ধাবিত হই। এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে বলি বস্ত্রের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে বলি অর্থের প্রয়োজন। এই তৃতীয় প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে বলি সুহৃদের প্রয়োজন। সেই চতুর্থ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে অন্তবিধ প্রয়োজনের উল্লেখ করি। বাস্তবিক যতই প্রয়োজন সাধন হয়, ততই নূতন নূতন প্রয়োজনের অবতারণা করি। এইরূপ অনন্তকাল প্রয়োজনীয় পদার্থের নমোল্লেখ করতঃ তাহা আয়ত্ত করিলেও প্রয়োজন থাকিবে এবং তদুদ্দেশে ধাবিত হইতে হইবে। বাস্তবিক যদি প্রয়োজনটা ঠিক কি তাহা জানিতাম, তাহা হইলে তদন্বেষণে প্রাণপণ করিতাম; এবং প্রয়োজন সম্যক সাধন করিয়া শান্তিলাভ করিতাম। এতদবস্থায় বলিতে হইবে যে এরূপ কোন প্রয়োজন আছে, যাহা জানিনা যে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই শান্তি লাভ করিব। অথবা বলিতে হইবে যে প্রয়োজন বলিয়া কিছুই নাই, সুতরাং তদন্বেষণে প্রয়োজন নাই। "এমন কোন প্রয়োজন আছে যাহা জানা যায় না" এবং "প্রয়োজন কিছুই নাই" এই দুই একই কথা। কারণ যখন বলি প্রয়োজন কিছুই নাই, তখন বিচার করিয়াই কিছু প্রয়োজন থাকে দেখিতে পাই না। আর "এমন কোন প্রয়োজন আছে, যাহা জানা যায় না।" বলিবার সময়েও বিচারে কিছু প্রয়োজন থাকা দেখিতে পাই না। প্রয়োজন কিছুই না থাকিলে আর প্রয়োজন সাধনের জন্ত নিরন্তর ক্লেশ পাইতে হয় না। "প্রয়োজন আছে" মনে করিয়াই তৎসাধনোদ্দেশে আমার ঈদৃশী অশান্তি। বাস্তবিক প্রয়োজন কিছু থাকিলে অবশ্যই তাহা কোন না কোন কালে কোন না কোন উপায়ে জানা যাইত এবং তাহার প্রতিবিধানও হইত। প্রয়োজন কিছুই নাই, সুতরাং তাহার প্রতিবিধানও নাই। "প্রয়োজন আছে" বিশ্বাসে তাহার প্রতিবিধান জন্ত আমার অশান্তির অবধি নাই। কিন্তু যখন প্রয়োজনই নাই, তখন আর তৎপ্রতিবিধান হেতু অশান্তি কেন? প্রয়োজন বলিয়া যে ভুল বিশ্বাসে এতাদৃশ উদ্বেগ, সে ভুল বিশ্বাস অপ্রয়োজন। অতএব প্রয়োজনে আর প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হেতুই যখন দুঃখ, আর যখন প্রয়োজন নাই, তখন ত প্রয়োজন না থাকাই প্রয়োজন।

ব্রহ্মজ্ঞানীই সুখী।

ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ

রসো ব্রহ্মরসং লব্ধা নন্দী ভবিতি নান্যথা।

অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন এবং আত্মজ্ঞানী শোক মোহ হইতে মুক্ত থাকেন। ব্রহ্ম-জ্ঞানীর আনন্দ অনিবার্য্য। এই শ্রুতি বাক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে পদার্থ-ধর্ম্ম—জন্ম মরণ অবস্থান একই বা কিছুই নহে এবং সেই বাক্যে জ্ঞান ব্রহ্মই সত্য প্রকাশ পাইতেছে।

সুখ কি?

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

যাহা নিশ্চয়ই অতি বৃহৎ বা অসীম তাহাতেই সুখ, ক্ষুদ্রে বা সীমাবদ্ধ কিছুতে সুখ নাই। পঞ্চদশী এই মহৎ বাক্যের যাথার্থ্যই প্রতিপাদন জন্য দেখাইতেছেন যে দশ বহিরিন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এবং অন্তরিন্দ্রিয় অন্তঃকরণ বা মন প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র পদবাচ্য। অতএব সুখ প্রদানে অসমর্থ চক্ষু দ্বারা সাময়িক দর্শন সুখ মাত্র হয় এবং ক্রমশঃ তাহার অবসান হয়। কর্ণ দ্বারা শ্রুতি সুখের, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ সুখের, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ সুখের, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ সুখের ক্ষণস্থায়ী অনুভব মাত্র হয় এবং ক্রমশঃ তাহার অবসান হয়। সেইরূপ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থের ক্রিয়া হেতু সুখের উদ্রেক এবং ক্রমশঃ তাহার অবসান হইয়া থাকে। যে উপস্থ বা জননেন্দ্রিয়-সুখ জন্য আমরা উন্মত্ত, সেই বৃথা ইন্দ্রিয় সুখেরও সীমা রহিয়াছে। কেন যে এই ঐন্দ্রিক সুখ সত্য নিত্য সুখ হইতে পারে না, তাহা কি আর বলিতে হইবে? ইহারা প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র বা সীমাবদ্ধ। যাহা সীমাবদ্ধ নহে, অতি বৃহৎ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম বা জ্ঞানানন্দব্রহ্ম, তিনিই প্রকৃত সুখ বা প্রকৃত সুখের নিদান।

কয়েকটি পুরাতন কথা।

কলিকাতা নন্দনবাগান নিবাসী ৺ কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় একজন বিচারপতি ছিলেন। রাজকার্য্য উপলক্ষে তিনি যখন যেখানে যান, প্রায় সকল স্থানেই ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। জেলা ২৪ পরগণায় যৎকালে প্রধান সদরআলা পদে নিযুক্ত থাকেন, ভবানীপুরকেও বিস্মৃত হয়েন নাই। ১৭৭৪ শক, ১২৫৮ সাল ৯ই আষাঢ় দিবসে তিনি তথায় "জ্ঞান প্রকাশিনী সভা" স্থাপিত করেন। প্রথমে উত্তর রসা রোডের ধারে ৺ শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় প্রতি সোমবার সন্ধ্যার পর ঐ সভার অধিবেশন হইত। শম্ভুনাথ বাবু তখন সদর দেও-য়ানি আদালতের উকীল এবং পরে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হন। ৺ রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি পদে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে বিচারাসন গ্রহণ ঘটে নাই। নূতন হাইকোর্টের কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। সেই জন্য পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহার স্থলে নিয়োগ করা হয়। ভবানীপুরের প্রধান প্রধান প্রায় সকলেই ঐ সভায় যোগ দিয়াছিলেন। বেদ উপনিষদ ও গীতা পাঠ হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের রচিত ব্রহ্ম-সঙ্গীতের পর সভায় কার্য্য শেষ হইত।

চারি মাস পরে পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সভার সভ্য হইলেন এবং তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা পদ্ধতি অবল-ম্বিত ও "ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজ" নামে ঐ সভা অভিহিত হইল। বয়ঃক্রম অনুসারে ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজ দ্বিতীয়, ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজ তৃতীয় এবং কৃষ্ণনগর ব্রাহ্ম-সমাজ চতুর্থ। সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভা-পতি পণ্ডিত মহাশয়, প্রতিনিধি সভাপতি হাইকোর্টের সরকারি উকিল ৺ অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, খ্যাতনামা সম্পাদক ৺ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহা-শয়, সহকারী সম্পাদক ৺ গোবিন্দচন্দ্র বসু ও ৺ প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হয়েন। ইংরাজী সংবাদ পত্র "হিন্দুপেট্রিয়টের" হরিশ বাবু প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। অর্থ সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান সমাজগৃহ নির্ম্মিত হইল এবং ১২৭০ সালের ৯ই আষাঢ় দিবসে দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ঐ নূতন গৃহে প্রবেশ করা হইল। ভবানীপুর অনেক শিক্ষিত লোকের স্থান। তথাকার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের উদ্যম ও উৎসাহে সমা-জের কার্য্য অতি সুচারু-রূপে চলিতে লাগিল। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে নূতন ব্যাপার এই ভবানী-পুরে অনুষ্ঠিত হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ধর্ম্ম-প্রচার জন্য ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ্য বক্তৃতা সমাজ-গৃহে দিবার ব্যবস্থা করেন এবং সেই সকল বক্তৃতা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইতে লাগিল। হরিশ বাবু অন্নদা বাবু ও বাবু কালীকুমার দাস কয়েকটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা কালে সমাজ-গৃহ শিক্ষিত লোক দ্বারা পরিপূর্ণ হইত। ঐ সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা মহা উদ্যমে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। ভবানীপুরে কলিকাতায় ও শ্রীরামপুরে তাঁহাদের অবৈতনিক বিদ্যা-লয় ছিল। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মে শিক্ষিত যুবকবৃন্দের আস্থা চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু তাহাদের শিক্ষার অনুরূপ কোনও উন্নত ধর্ম্ম তাহাদের সম্মুখে প্রদর্শিত হয় নাই। কাজেই ঐ সকল খৃষ্ট-বিদ্যালয়ের কতকগুলি ভাল ভাল ছাত্র খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এই স্রোত প্রতি-রোধ করার অভিপ্রায়ে ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই পরে সমুদায় সমাজে গৃহিত হইয়াছে।

হরিশ বাবুর বক্তৃতা গুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্ত্তি কখনই লোপ হইবার নহে। এস্থলে তাহা বিশদ রূপে বলিবার আবশ্যক নাই। সং-ক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। নীলকরদের অত্যাচার তাঁহার লেখনীর বলে নিবারণ হয়। সিপাহী বিদ্রোহ কালে লর্ড ক্যানিংএর কার্য্য সকল তিনি অতি-শয় পারদর্শিতা সহকারে সমর্থন করিতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, প্রতি সোমবার প্রাতে একজন অশ্বারোহী রাজদূত "পেট্রিয়ট" কাগজের প্রথম খণ্ড লইয়া যাইবার জন্য কার্য্যালয়ের সম্মুখে উপস্থিত থাকিত। হরিশ বাবুর শেষ পীড়ার সময় লর্ড ক্যানিং তাঁহার বাটীতে এডিকং পাঠাইয়া সংবাদ লইতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাতেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বক্তৃতার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, যুক্তিও সেই প্রকার অকাট্য। সুতরাং তৎসমু-দয় অতীব হৃদয়গ্রাহী হইত। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ্য বক্তৃতা যে ধর্ম্মপ্রচারের একটি প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা তিনি বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর The Brahmo Somaj, its Position ond Prospects" বিষয়ে প্রথম, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি The Positive Theology of the Brahmo Somaj" বিষয়ে দ্বিতীয় এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে The Utility of Public Worship" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা দেন। শেষোক্ত বক্তৃতা পাঠ করিয়া শ্রীরামপুরের তৎকালীন "Friend of India" সম্পাদক লিখিয়াছিলেন "কোনও ইংরেজ অবশ্যই ইহার লেখক।" তদুত্তরে হরিশ বাবু তাঁহার সংবাদ পত্রে লেখেন যে

"ইংরেজ নহেন, এক জন কুলীন ব্রাহ্মণ ইহার লেখক।" "The Ethics of Bhagabatgita" বিষয়ে তাঁহার চতুর্থ বক্তৃতা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা মুদ্রিত হয় নাই এবং লেখাটিও পাওয়া যায় নাই। আমার বাল্য বন্ধু শ্রদ্ধেয় ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী ঐ তিনটি বক্তৃতা পুস্তিকাকারে সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বহুলরূপে এই বক্তৃতাগুলি শিক্ষিত লোকে পাঠ করেন ইহাই প্রার্থনীয়। হরিশ বাবু লক্ষণ-যুক্ত পুরুষ ছিলেন। দীর্ঘাকার (৬ফুট লম্বা), অজানুলম্বিত বাহু, বিস্তৃত বক্ষঃ এবং ভ্রূযুগল জোড়া ও ঘন। এমন সকল মানুষের অকাল মৃত্যুতে বাস্তবিক ক্ষুব্ধ হইতে হয়।

"The Age and its wants বিষয়ে কালীকুমার বাবুর বক্তৃতা ছিল। ইনি সুবিখ্যাত Phrenologist ছিলেন এবং খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ে অনেক লিখিয়াছিলেন। "Age and its wants" বিষয় বক্তৃতা শুনিতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক খ্যাতনামা ডাক্তার ডফ আসিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের সহিত ভবানীপুর সমাজের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। হিমালয়ে যোগ সাধন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নবানুরাগে ও পরম উৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা। এই সময়ে আচার্য্য কেশব-চন্দ্র ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। মহর্ষি আদি. সমাজের বেদী হইতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" নামে ঐ সকল উপদেশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। উপদেশ গুলি এতই উচ্চ, যে ব্রাহ্ম-সমাজে কেন সমগ্র ধর্ম্ম-জগতে উহা চির-আদৃত থাকিবে। তদ্ভিন্ন আদি-সমাজের দ্বিতল গৃহে তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। প্রতি রবিবার প্রাতে তথায় তিনি ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উপদেশ দিতেন। মহর্ষির দশটি উপ-দেশ "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে ছে কলিকাতার পরেই ভবানীপুর মহর্ষির এক প্রধান প্রচার-ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। প্রতি সোমবার তথাকার সমাজের বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতে ও উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহার উপর আবার সেখানেও ব্রহ্ম-বিদ্যালয় খুলিলেন। মাসের প্রথম রবিবার প্রাতে আদিসমাজে মাসিক উপাসনা হইত। সুতরাং প্রথম রবিবার ভিন্ন প্রতি রবিবার প্রাতে ভবানীপুর বিদ্যালয়ে উপদেশ দেওয়া হইত। ঐ সকল উপদেশ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইত। ছাত্রদিগকে লিখিত প্রশ্ন দেওয়া হইত। প্রশ্ন ও ভাল ভাল উত্তর গুলিও মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা হইত। প্রাতে ৭॥ ঘণ্টার সময় বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইত। অতি প্রত্যূষে মহর্ষি শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে নিজ ভবন হইতে বহির্গত হইতেন। ধর্ম্মতলায় গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে ময়দান পার হইয়া কেথিড্রেল গিরজার নিকট আবার গাড়ীতে উঠিতেন। ঐ সময়ে ৯ই আষাঢ় শনিবার পড়ে। উৎসবের কার্য্য শেষ হইতে রাত্রি হইয়া যায়। পরদিন ব্রহ্মবিদ্যালয়। মহর্ষি যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন ছাত্রেরা প্রায় সকলেই অনুপস্থিত। বিলম্বে সকলে আসিলে মহর্ষি বলিলেন "কাল তোমাদের শুইতে রাত্রি হইয়াছিল।" ছাত্রেরা লজ্জিত হইয়া মনে মনে হাস্য করিয়া বলিতে লাগিল "আমরা যুবা ও স্থানীয় লোক; ঠাকুর! আপনি জোড়াসাঁকো হইতে আমাদের অগ্রে আসিলেন!!" ইতিপূর্ব্বে তিনি এক দিন উপদেশ দিয়াছিলেন "সূর্য্য কেমন নিয়মিত সময়ে উদিত হয়; মেঘ ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টি হইলেও সে যথাকালে পূর্ব্ব আকাশে সমুদিত। তোমরাও সূর্য্যের ন্যায় হইবে।" ইহার মর্ম্ম ছাত্রেরা ঐ দিন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। ৺ হেমেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ পুত্রত্রয় প্রায়ই মহর্ষির সঙ্গে আসিতেন। এক বৎসর কার্য্যের পর বিদ্যালয় বন্ধ হয়। সেই সময়ে মহর্ষি চুঁচুড়ায় ব্রহ্ম-বিদ্যালয় করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় এই সময়ে ভবানীপুর সমাজের সম্পাদক। তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কয়েকজনকে লইয়া এক প্রতি-নিধি অধ্যক্ষ সভা গঠন করেন। ঐ সভার যত্নে আবার সমাজ-গৃহে ইংরাজী বক্তৃতা হয়। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্রের কৌমার বক্তৃতা এই ভবানীপুরে হইয়াছিল। ৺ ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয় এবং আরও কয়েকজন বক্তৃতা করেন। এই সকল বক্তৃতার সময় মহর্ষি উপস্থিত থাকিতেন।

দুই বৎসর পরে মহর্ষি ভবানীপুরে আবার বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করেন। এক বৎসর উপদেশের পর পরীক্ষা করা হয়। ছাত্রদিগকে পৃথক পৃথক বসাইয়া লিখিত প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করা হইত। আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রহরী থাকিয়া উত্তর লইয়া যাইতেন। পরীক্ষায় তের জন উত্তীর্ণ হয়েন। পার্চমেণ্টে ঐ তের জনকে প্রশংসা-পত্র দেওয়া হয়। কলিকাতা সমাজের তৎকালীন সম্পাদক রূপে ব্রহ্মানন্দ প্রশংসা-পত্রে স্বাক্ষর করেন। মহর্ষির কতই আনন্দ—কতই পুত্রবৎ স্নেহ। এ জীবনে চিত্তপট হইতে তাহা অপসারিত হইবার নহে। দেখা হইলেই সাদর আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ। প্রত্যেকের শারীরিক ও পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা। নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে আহার এবং পারিবারিক অনু-ষ্ঠানে ও মাঘোৎসবে আহ্বান। তাঁহার স্বর্গীয় ভাব ও সরল প্রেম সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিত। সটীক "ব্রাহ্মধর্ম্ম" ও তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ পুরাতন ছাত্র-দিগকে নিজ হস্তে লিখিয়া উপহার দিতেন। বৃদ্ধ বয়সে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ভাল ভাল কর্ম্ম করিতেছেন।" ভবানীপুরের নেতাদিগকে এতই ভাল বাসিতেন যে শম্ভুনাথ বাবু ও হরিশ বাবুর মৃত্যুর পর উৎসব উপলক্ষে ভবানী-পুরের বেদী হইতে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের আত্মার কল্যাণার্থে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীনাথ বাবুর বয়ঃক্রম এখন ৮৭ বৎসর হইয়াছে। প্রথম হইতে তিনি এই সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য। যদিও এখন দেহে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি তাঁহার উৎসাহের খর্ব্বতা নাই।

কলিকাতায় "তত্ত্ববোধিনী সভার" ন্যায় ভবানীপুরের "সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী" সভাও কার্য্য করিত। ঐ সভার এক খানি পত্রিকা ছিল। ৺ নবকৃষ্ণ বসু মহাশয় ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রচলিত হিন্দু ও খৃষ্ট ধর্ম্মে কোনও প্রভেদ নাই, ইহাই ঐ পত্রিকা প্রতিপাদন করিত। অপর দিকে কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ খৃষ্টধর্ম্মের

সহিত বিষম যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে খৃষ্টধর্ম্মের স্রোত আর অপ্রতিহত বেগে চলিতে পারিল না। শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। নবকৃষ্ণ বাবু ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। এক দিন ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের কার্য্য শেষ করিয়া মহর্ষি নবকৃষ্ণ বাবুকে দেখিতে গেলেন এবং অবস্থা দেখিয়া কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়াছিলেন।

এখন আর ভবানীপুরের সে দিন নাই। সে মহর্ষি নাই, স্থানীয় লোকেরও সে ধর্ম্মোৎসাহ নাই। পূর্ব্বের তুলনায় এখন ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের শোচনীয় অবস্থা। সমাজ-গৃহ পর্য্যন্ত জীর্ণ হওয়ায় তাহার সংস্কার চলিতেছে।*

এস্থলে মহর্ষির আকর্ষণী শক্তির বিষয় কিছু না বলিয়া উপসংহার করা যায় না। স্কুলে পড়ার সময়ে, এক দিন আমার সমপাঠী আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেন "ওহে! আজ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভবানীপুর সমাজে আসিবেন।" আগ্রহের সহিত দুই জনে সমাজে গেলাম এবং এতদূর আকৃষ্ট হইলাম যে স্কুলের পর রসা হইতে হাঁটিয়া ধর্ম্মতলায় স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অফিসে গিয়া প্রতি বুধবার তাঁহার গাড়ীতে জোড়াসাঁকো সমাজে যাইতাম। সমাজের পর মহর্ষির ভবনে অধ্যক্ষ সভা হইত। বেচারাম বাবু অধ্যক্ষ সভার একজন সভ্য ছিলেন। কাজেই বেচারাম বাবুর ফিরিতে রাত্রি হইয়া পড়িত। আমরাও তাঁহার সঙ্গে ফিরিতাম। নগেন্দ্র বাবু বেচারাম বাবুর সঙ্গে বেহালা গিয়া তথায় রাত্রি কাটাইতেন। আমি বাটী আসিয়া দেখিতাম সকলে নিদ্রিত। কাহাকেও না ডাকিয়া অনশনে রাত্রি যাপন করিতাম। আকর্ষণ ব্যতীত এতাধিক কষ্ট স্বীকার সম্ভব নহে। তখনও মহর্ষির সহিত পরিচয় হয় নাই। ব্রহ্মবিদ্যালয় হইলে পরিচিত হইলাম।

শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক।
অবসর প্রাপ্ত সবজজ।

* এমন একদিন গিয়াছে হাইকোর্টের জজ স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্র ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় নিজেরা দড়ী ধরিয়া ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের বারাণ্ডায় পত্তন দেন। হায় বর্ত্তমান কালে শিক্ষিত সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন। সে উদ্যম সে অধ্যবসায় আর নাহি। সহ সং।

নানা কথা।

শোকসভা।—সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃত্যু উপলক্ষে ভারত-সঙ্গীত-সমাজের বিশেষ উদ্যোগে কলিকাতার ময়দানে ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বিরাট শোকসভা আহূত হইয়াছিল। প্রায় চল্লিশ হাজার লোক সমাগত হন। সকলেরই মুখে শোক ও বিষাদের কালিমা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিরচিত সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১

কি হ'ল কি হ'ল, কি শুনালি বল;
বিনা মেঘে একি বাজ রে!
সৌম্য, শান্ত, ধীর প্রশান্ত,
নাহি সে রাজাধিরাজ রে!
কন্যা-কুমারী হ'তে হিমালয়,
'নাই' 'নাই' 'নাই' প্রতিধ্বনি বয়;
সারা ধরা আজি অন্ধকার-ময়;
নাহি সে রাজাধিরাজ রে!
আঁখি আবরিয়া কাঁদে রাজেন্দ্রাণী;
কহ তাঁরে দুটী সান্ত্বনার বাণী;
কাঁদিয়া আকুল ভারত দুঃখিনী;
স্মরিয়া তোমারে আজ রে!
গেলে চলে যদি ত্যজি ইহধাম,
শান্তিপূর্ণ হোক তোমার বিশ্রাম!
কাঁদিছে ভারত স্মরি গুণগ্রাম
(পরি) নববর্ষে শোক-সাজ রে!
অক্ষয় স্বর্গ ভিক্ষা তব আজ
মাগিছে কাতরে সঙ্গীত সমাজ;
দিব্য ধামে পরি নব দিব্য সাজ,
থাক আনন্দে অমরা মাঝ রে!
(আজি) জননী ধরণী লবে তুলে কোলে;
ঢেকে দিবে বপু শ্যামল আঁচলে;
বল হরি হরি, হরিবোল ব'লে
(সবে) পরাও কুসুম-সাজে রে!

২

চল ভাই চল ধীরে অতি ধীরে।
দিতে রাজার প্রতিমা বিসর্জ্জন অনন্ত নীরে॥
কি ফল বিফল, ফুকারি রোদন,
পুষে রাখ হৃদে হৃদয়-বেদন,
কেঁদে চির দিন, দীন মোরা আর, পাবনা
অমন রাজারে ফিরে॥
কররে নীরব সংসারের রোল,
সারা বঙ্গবাসী বল হরি হরি বোল,
হরিনামে স্বর্গধামে ঐ যায় গো রাজা স্বশরীরে।
দয়াল হরি দিও তরী ভব-পারাবার তীরে॥
(মহারাজারে) ভব-পারাবার তীরে॥
যাও প্রভু যাও বৈজয়ন্ত ধামে,
দেবের প্রসাদে জ্যোতির্ম্ময় বামে, বিরাজ বিরামে,
করুণ নিদান, তুমি পুণ্যবান্, পর অমর মুকুট শিরে॥

সপ্তদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮১।
৮০৪ সংখ্যা | ১৮৩২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

মঙ্গল।

(পঞ্চম উপদেশের অনুবৃত্তি)

আমার মধ্যে আছে বলিয়াই যে নৈতিক পুরুষটি আমার নিকট পবিত্র তাহা নহে,—নৈতিক পুরুষ বলিয়াই পবিত্র। নৈতিক পুরুষটি স্বতই শ্রদ্ধেয়; নৈতিক পুরুষ সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধার পাত্র।

এই নৈতিক পুরুষটি যেমন আমার মধ্যে আছেন, তেমনি তোমার মধ্যেও আছেন;—উভয়ত্রই আছেন একই অধিকার-সূত্রে। আমার নিজের সম্বন্ধে, তিনি আমার উপর যে কর্ত্তব্যের ভার ন্যস্ত করেন, সেই কর্ত্তব্যটি আবার তোমার মধ্যে একটি অধিকারের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়; এবং এই সূত্রে আবার তোমার সম্বন্ধে, আমার একটি নূতন কর্ত্তব্য আসিয়া পড়ে।

সত্য যেমন আমার পক্ষে আবশ্যক, তেমনি তোমার পক্ষেও আবশ্যক। কেন-না, সত্য যেমন আমার বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ম, তেমনি তোমার বুদ্ধিবৃত্তিরও নিয়ম। সত্যই বুদ্ধিবৃত্তির নিজস্ব ধন। তাই, তোমার চিত্ত-বৃত্তির বিকাশের প্রতিও আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য; সত্যের পথে তোমার চিত্ত যাহাতে বাধা না পায়, এমন কি, সত্যের অর্জ্জনে সুবিধা সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তৎপ্রতিও আমার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

তোমার স্বাধীনতার প্রতিও আমার সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। এমন কি, তোমার কোন দোষ ত্রুটি নিবারণ করিবারও সকল সময়ে আমার অধিকার নাই। স্বাধীনতা এমনি একটি পবিত্র সামগ্রী যে, উহা যখন বিপথগামী হয়, তখনও উহাকে একেবারে বাধা না দিয়া, কতকটা উহাকে বাগাইয়া আনিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। অনেক সময় আমরা কোন মন্দ নিবারণ করিবার জন্য অতিমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভুল করি। ভাল মন্দ দুই ঈশ্বরের বিধান। কোন আত্মাকে বলপূর্ব্বক সংশোধন করিতে গিয়া তাকে আমরা আরও পশুবৎ করিয়া ফেলি।

যে সকল অনুরাগ বৃত্তি তোমারই অংশ রূপে অবস্থিত, সেই সকল অনুরাগের প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য; এবং যত প্রকার অনুরাগ আছে তন্মধ্যে পারি-

বারিক অনুরাগ-গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র। আপনাকে আপনার বাহিরে প্রসারিত করা, (বিক্ষিপ্ত করা নহে) সুনিয়ন্ত্রিত ও ধর্ম্মের দ্বারা পূত কোন একটি অনুরাগের দ্বারা কতকগুলি আত্মার মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করা—এইরূপ একটি দুর্নিবার প্রয়োজন আমাদের মধ্যে আছে। পরিবারমণ্ডলীর দ্বারাই আমাদের এই প্রয়োজন চরিতার্থতা লাভ করে। মানুষের প্রতি অনুরাগ—ইহা একটি সাধারণ অনুরাগ। পারিবারিক অনুরাগ—কতকটা আত্মানুরাগ হইলেও নিরবচ্ছিন্ন আত্মানুরাগ নহে। যে পরিবারবর্গ প্রায় আমাদের নিজেরই মত, সেই পরিবারবর্গকে নিজেরই মত ভালবাসিবে—ইহাই পারিবারিক অনুরাগ। এই অনুরাগ,—পিতা,মাতা, সন্তান—ইহাদের পরস্পরকে একটি সুমধুর অথচ সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে; পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা পাইয়া সন্তানগণ অমোঘ আশ্রয় লাভ করে এবং পিতামাতারও চিত্ত আশা ও আনন্দে পূর্ণ হয়। তাই, দাম্পত্য-অধিকারের প্রতি কিংবা পিতামাতার অধিকারের প্রতি আক্রমণ করিলে, আত্মা-পুরুষের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র, তাহাকেই আক্রমণ করা হয়।

তোমার ধনসম্পত্তির প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, কেন না উহা তোমার শ্রমের ফল। তোমার শ্রমের প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য; কারণ, স্বাধীনতাকে কাজে খাটানোই শ্রম। তুমি যদি তোমার ধন সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া থাক, তাহা হইলেও, যে স্বাধীন ইচ্ছা ঐ ধন সম্পত্তি তোমাকে দান করিয়া গিয়াছে, সেই স্বাধীন ইচ্ছাকেও আমার সম্মান করা কর্ত্তব্য।

অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকেই ন্যায়াচরণ বলে। কাহারও অধিকার লঙ্ঘন করাই অন্যায়াচরণ।

সকল প্রকার অন্যায়াচরণই আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষটির প্রতিই উৎপীড়ন; আমাদের লেশমাত্র অধিকার খর্ব্ব করিলেই, আমাদের নৈতিক পুরুষটিকেই খর্ব্ব করা হয়; অন্তত উহার দ্বারাই পুরুষকে জিনিসের পদবীতে নামাইয়া দেওয়া হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অন্যায়াচরণ কি?—না দাসত্ব। কেন না, সকল অন্যায়াচরণই এই দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত। আর এক জনের লাভের জন্য, কোন ব্যক্তির সমস্ত মনোবৃত্তিকে তাহার সেবায় নিযুক্ত করাই দাসত্ব।

দাসের যে টুকু বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধিত হয়—সে কেবল বিদেশী প্রভুর স্বার্থের জন্য। দাসের বুদ্ধিবৃত্তি প্রভুর কাজে আসিবে বলিয়াই তাহাকে কতকটা তাহার বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিতে দেওয়া হয়। কখন-কখন ভূমির সহিত আবদ্ধ দাসকে সেই ভূমির সহিত বিক্রয় করা হয়; কখন বা দাসকে প্রভুর শরীরের সহিত শৃঙ্খলিত করা হয়। যেন তাহার কোন স্নেহ মমতা থাকা উচিত নহে, যেন তাহার কোন পরিবার নাই, তাহার পত্নী নাই, তাহার সন্তানসন্ততি নাই, এইরূপ মনে করা হয়। তাহার কাজ কর্ম্ম তাহার নহে, কেন না, তাহার পরিশ্রমের ফল অন্যের ভোগ্য। শুধু তাহাই নহে; দাসের অন্তর হইতে স্বাভাবিক স্বাধীনতার ভাবকে উন্মূলিত করা হয়, সর্ব্বপ্রকার অধিকারের ধারণাকে নির্ব্বাপিত করা হয়; কেন না, এই ভাবটি দাসের অন্তরে থাকিলে, দাসত্বের স্থায়িত্বের প্রতি দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায় না, কেন না তাহা হইলে এক সময়ে প্রভুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার জাগিয়া উঠিতে পারে।

ন্যায়-ব্যবহার, এবং যাহার উপর মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন,—ইহাই মানুষের প্রতি মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাই কি একমাত্র কর্ত্তব্য?

আমরা যদি অন্যের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি, যদি তাহার স্বাধীনতায় বাধা না দিই, তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উচ্ছেদ না করি, যদি তাহার পরিবারের প্রতি কিংবা তাহার ধনসম্পত্তির প্রতি আক্রমণ না করি, তাহা হইলেই কি আমরা বলিতে পারি—তাহার সম্বন্ধে আমরা সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিলাম? মনে কর, একজন হতভাগ্য ব্যক্তি তোমার চোখের সামনে কষ্ট পাইতেছে; আমরা তাহার কষ্টের কারণ নহি,—এইটুকু সাক্ষ্য দিতে পারিলেই কি আমাদের অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হয়? না; কে যেন আমাদিগকে বলে,—তাহাকে একটু অন্নদান করা, আশ্রয় দান করা, সান্ত্বনা দান করা আরও ভাল।

এইখানে একটি গুরুতর প্রভেদ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। যদি তুমি অন্যের দুঃখ কষ্টকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কঠোর-হৃদয় হইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার অন্তরাত্মা তোমাকে ভৎর্সনা করিবে; কিন্তু তাই বলিয়া, যে ব্যক্তি কষ্ট পাইতেছে, এমন কি মরিতে বসিয়াছে,—তোমার প্রভূত ধনসম্পত্তি থাকিলেও সেই ধন সম্পত্তির উপর সেই ব্যক্তির লেশমাত্র অধিকার নাই; এবং সে যদি একগ্রাস অন্নও তোমার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে সে অপরাধী হইবে। এই স্থলে আমরা এমন এক শ্রেণীর কর্ত্তব্য দেখিতে পাই—যাহার অনুরূপ অন্যের কোন অধিকার নাই। কোন ব্যক্তি স্বীয় অধিকারের প্রতি সম্মান আদায় করিবার জন্য বলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু যতটুকুই হোক্ না কেন,—সে অন্যের নিকট হইতে ত্যাগ আদায় করিতে পারে না। ন্যায়পরতা অন্যের সম্মান বজায় রাখে, অন্যের অধিকার পুনরুদ্ধার করে। দয়াধর্ম্ম দান করে—স্বাধীন ভাবে, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দান করে।

দয়াধর্ম্ম অন্যকে দান করিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে নিজেকে বঞ্চিত করে। যখন দানশীলতা এতটা প্রবল হয় যে, আমাদের প্রিয়তম স্বার্থসমূহকেও বিসর্জ্জন করিতে আমরা উত্তেজিত হই—তখন সেই দানশীলতা আত্মত্যাগ নামে অভিহিত হয়।

অবশ্য এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান আমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু, ন্যায়-ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্যের নিয়ম যেরূপ সুনির্দ্দিষ্ট ও দুর্নম্য, দানধর্ম্মের কর্ত্তব্যও সেইরূপ। দান কি?—না অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার। ত্যাগের নিয়ম, কিংবা আত্মবিসর্জ্জনের মূলসূত্র কেহ কি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতে পারে? কিন্তু ন্যায়ের মূলসূত্রটি সুস্পষ্ট:—অন্যের অধিকারকে সম্মান করা। দানধর্ম্মের কোন নিয়মও নাই, কোন সীমাও নাই। ইহা সকল বাধ্যতাকে অতিক্রম করে। উহার স্বাধীন চেষ্টাতেই উহার সৌন্দর্য্য।

কিন্তু একটি কথা এইখানে স্বীকার করা আবশ্যক:—দানধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও কতকগুলি বিপদ আছে। দানধর্ম্ম যাহার উপকার করিতে ইচ্ছা করে, তাহার চেষ্টার স্থলে আপনার চেষ্টাকে স্থাপন করিবার দিকে তাহার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। কখন কখন, দানধর্ম্ম সেই দান-

পাত্রের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ করে, সে একপ্রকার তাহার বিধাতাপুরুষ হইয়া দাঁড়ায় ঃ—মানুষের পক্ষে যাহা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। অন্যের প্রয়োজন সাধন করিতে গিয়া, দানধর্ম্ম তাহাদের প্রভু হইয়া বসে এবং তাহাদের স্বাভাবিক অধিকারগুলির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেও পারে—এইরূপ আশঙ্কা হয়। অবশ্য অন্যকে কোন কাজে প্রবৃত্ত কিংবা কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত করা নিষিদ্ধ নহে। অনুনয় বিনয়ের দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। আবার যদি কেহ অপরাধের কাজ কিংবা নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াও সে কাজ হইতে আমরা তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারি। যখন কেহ কুপ্রবৃত্তির প্রচণ্ড আবেগে নীয়মান হইয়া তাহার স্বাধীনতা হারায়, তাহার ব্যক্তিত্ব হারায়, তখন তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিবারও আমাদের অধিকার আছে।

কেহ আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকেও আমরা এইরূপে বল পূর্ব্বক নিবারণ করিতে পারি। যখন আমরা কাহারও সম্বন্ধে আত্মকর্তৃত্বের পরিবর্তে পরকীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করা আবশ্যক মনে করি, তখন দেখিতে হইবে তাহার কতটা স্বাধীনতার শক্তি আছে; কিন্তু ইহা কি করিয়া নিশ্চিত রূপে জানা যাইবে? যখন কোন দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির উপকার করিতে গিয়া, আমরা তাহার আত্মাকে একেবারে দখল করিয়া বসি, কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে আমরা আরও বেশী দূরে যাইব না?—যাহার উপর আমাদের প্রেমের প্রভুত্ব, সেই ব্যক্তির উপর হইতে প্রেম চলিয়া গিয়া, অবশেষে তাহার স্থলে আমাদের প্রভুত্বের প্রেম আসিয়া পড়িবে না—ইহা কে বলিতে পারে? অনেক সময়, পরসম্পত্তি দখল করিবার উদ্দেশে, দানধর্ম্ম একটা সূচনামাত্র, একটা ছলমাত্র হইয়া থাকে। দয়ার উত্তেজনায়, অবাধে দান করিবার অধিকার আমাদের তখনই হয় যখন আমরা ন্যায়ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হইয়া আপনার উপর দৃঢ় আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

অন্যের অধিকারকে সম্মান করা, এবং অন্যের উপকার করা,—যুগপৎ ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল হওয়া—ইহাই সামাজিক ধর্ম্মনীতি; এই দুই উপাদানেই সামাজিক ধর্ম্মনীতি গঠিত। (ক্রমশঃ)

জাতিভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বন্ধনী-(Ligament)-সম্বদ্ধ অস্থিপরম্পরা দ্বারা শরীরের একটা সামান্য আকৃতি জন্মে, বিশেষ আকৃতি অর্থাৎ ভেদপরিচায়ক আকৃতি জন্মে না। তাহা পেশীসন্দর্ভের দ্বারাই জন্মিয়া থাকে। অভ্যন্তরস্থ ঐ আকৃতির নাম কঙ্কাল। দেহে দেহে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা মাংসময়ী পেশীর বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশ বশতঃ। পেশীরই সন্নিবেশ (সাজান) বিশেষে দেহের সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্য সংঘটন হয় এবং এ, সে, তুমি, আমি ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান জন্মে। সেই জন্য, পেশীশূন্য কঙ্কাল দেখিলে, যে ব্যক্তির কঙ্কাল সে ব্যক্তি কি আকৃতির মনুষ্য ছিল তাহা সহজে বুঝা যায় না। পেশী সন্নিবেশের ঐ শক্তি আপামর সাধারণ সকলেরই জানা আছে। যেমন, ব্যক্তিভেদে পেশী সন্নিবেশ বিভিন্ন, তেমনি জাতিভেদেও পেশী সন্নিবেশ বিভিন্ন; পরন্তু সে বিভিন্নতা সক-

লের উপলব্ধি গোচর হয় না। কারণ এই যে, পেশীর সন্নিবেশন ও তাহার স্বভাবাদি বিষয়ে অধিকাংশ লোকই অব্যুৎপন্ন ; তাই তাহারা জাতিভেদে পেশী সন্নিবেশের প্রভেদ দেখিবা মাত্র বুঝিতে পারে না। পরন্তু যাঁহারা এই রহস্যে ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা জাতিভেদে পেশীসন্নিবেশের প্রভেদ অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারেন। একজন ব্রাহ্মণকে যবন বেশে ও একজন যবনকে ব্রাহ্মণ বেশে সজ্জিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখীন করিলে, তাঁহারা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন—এই লোকটা ব্রাহ্মণ ছিল ও ঐ লোকটা যবন ছিল। বীরাচারী তান্ত্রিকদিগের একটী কার্য্য দেখিলে সিদ্ধান্ত হইবে, জাতিভেদে অস্থিপ্রভৃতিরও বিভিন্নভাব জন্মে। আমাদের এই দেশে এখনও অনেক বীরাচারী তান্ত্রিক আছেন, তাঁহারা পঞ্চমুণ্ডি আসন প্রস্তুত করিয়া তদুপরি উপবেশন করতঃ জপ ধ্যানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। পঞ্চমুণ্ডি আসন প্রস্তুত করিতে চণ্ডাল-কঙ্কালের মস্তক লাগে। তাঁহারা যে চষক অর্থাৎ মদ্যপানের পাত্র ব্যবহার করেন, তাহাও চণ্ডালের মাথার খুলি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত সম্প্রদায়ের সাধকেরা কঙ্কালচ্যুত শত শত শুষ্ক নরমস্তকের মধ্য হইতে যেটী চণ্ডালের মস্তক সেইটীই চিনিয়া লয়েন। একদা এক সাধককে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়াছিলেন, মৃত মস্তক দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি —এটী চণ্ডালের মাথা, এটী চণ্ডালের মাথা নহে।

কোন্ লক্ষণে তাঁহারা বুঝেন, তাহা আমরা জানি না। ডাক্তারেরা যেমন, উর্ব্বস্থি দেখিয়া বুঝিতে পারেন,—এই উর্ব্বস্থি স্ত্রীলোকের ও এই উর্ব্বস্থি পুরুষের, তেমনি তান্ত্রিক সাধকেরাও বুঝিতে পারেন —এই মুণ্ড চণ্ডালের ও এই মুণ্ড ব্রাহ্মণের।

এ দেশের বাস্তুশাস্ত্রে একটী বিধান আছে। বিধানটীর নাম শল্যোদ্ধার বিধি। বিধানের বিবরণ এই যে, যে স্থানে মৃত্তিকার মধ্যে গর্দ্দভের, বানরের, কুক্কুরের, বিপ্রজাতীয় মানবের ও তদ্বিজাতীয় মানবের অস্থি থাকে, সে স্থানে তদুপরি গৃহ নির্ম্মাণ করিলে গৃহপতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অমঙ্গল হইতে থাকে। অস্থিভেদে অমঙ্গলের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। অমঙ্গল বাক্য দৃষ্টে গণকেরা গণনার দ্বারা জ্ঞাত হন, গৃহের অমুকস্থানে এত হাত মাটীর নীচে অমুক জাতীয় অস্থি আছে, তাই এই সকল অমঙ্গল হইতেছে। পরে সেই স্থানে খনন করিয়া অস্থি তুলিয়া ফেলা হয়, তখন গৃহস্থের অমঙ্গল স্রোত বিনিবৃত্ত হয়। এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদিত হইতে প্রবন্ধ লেখক দেখিয়াছেন। যদিও ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে অস্থির আকারগত কোন রূপ বৈলক্ষণ্য আমরা দেখিতে পাই না, অথবা বুঝিতে পারি না, তথাপি, সে সকলের শক্তিগত বৈলক্ষণ্য থাকা শল্যোদ্ধার বিধান দৃষ্টে অনুমিত হয়। যখন গৃহের অমুক স্থানে এত হাত মাটীর নীচে অমুকের অস্থি আছে, এ গণনা সকল সত্য হইতে দেখি, তখন আমরা ব্রাহ্মণাদি জাতির পরস্পর পার্থক্য থাকা অবিশ্বাস করিতে পারি না।

অধ্যাত্মতত্ত্ববিবেক নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সাত্ত্বিক দেহ ষট্‌বিধ, রাজস দেহ সপ্তবিধ ও তামস দেহ নানাবিধ। তন্মধ্যে মনুষ্য জাতীয় সাত্ত্বিক দেহের অন্য নাম আর্য-দেহ। যদিও সমুদায় দেহই অস্থি মজ্জা মাংস প্রভৃতির দ্বারা রচিত, যদিও প্রত্যেক দেহেই শোনিত ও পিত্ত প্রভৃতি

ধাতু আছে, যদিও দেহে দেহে যকৃৎ প্লীহা ও হৃদয় প্রভৃতি যন্ত্র আছে, দেহে দেহে শিরা ধমনী ও স্নায়ু প্রভৃতি বিদ্যমান আছে, তথাপি ঐ সকল পদার্থের স্বভাব ও সন্নিবেশাদি সকল দেহে ঠিক সমান বা একরূপ নহে। দেহে দেহে ও অংশে অংশে প্রভেদ যুক্ত। যেমন দেহে দেহে প্রভেদ যুক্ত তেমনি জাতিভেদেও প্রভেদযুক্ত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতীয় দেহের শিরা সন্নিবেশাদি যেরূপ, সে সকলের কার্য্যকারিতা যেরূপ, ক্ষত্রিয় দেহে ঠিক সেরূপ নহে। কোন না কোন অংশে অতীব দুর্লক্ষ্য প্রভেদ বিদ্যমান থাকে। পুরাণলেখক ঋষি কল্কীপুরাণের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এইরূপ একটি কথা লিখিয়া গিয়াছেন। "নাড়ী প্রকৃতিস্ত্রিবৃৎ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতীয় দেহের অভ্যন্তরগত নাড়ী প্রতানে ত্রিবৃৎপ্রকৃতি থাকা দৃষ্ট হয়। এই ত্রিবৃৎপ্রকৃতি কি? তাহা আমরা জানি না, বুঝিও না। সামান্যতঃ অনুমানে বোধ হয়, ব্রাহ্মণজাতীয় দেহের শিরাজাল ও স্নায়ুমণ্ডল যেরূপে, অথবা যদ্রূপ সংস্থানে অবস্থিত, অন্যজাতীয় দেহের অভ্যন্তরস্থ শিরাজাল ঠিক্ সেরূপ সংস্থানে সজ্জিত ও অবস্থিত অর্থাৎ সন্দর্ভিত নহে। কোননা কোন রূপে, কোননা কোন অংশে, বৈলক্ষণ্য বা প্রভেদ থাকে। ইহাই যদি প্রাগুক্ত ঋষির অভিহিত "নাড়ীস্থ প্রকৃতিস্ত্রিবৃৎ" কথার অর্থ হয়, আর উহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে ও মান্য করিতে বাধ্য যে, জাতিভেদ কথা কেবলমাত্র সমাজবন্ধনের জন্য সমাজস্থ লোকের কল্পিত নহে। অবশ্যই উহার প্রাকৃতিকত্ব কোন না কোন অংশে আছে অদ্যপি তাহা জনসাধারণের অজ্ঞাতে রহিয়াছে। অতএব, মনুষ্যের জাতিভেদ,এ কথা অশ্ব ডিম্বাদি কথার ন্যায় কেবলমাত্র জন কল্পনা প্রসূত নহে বলিয়া মনে হয় ও অনুমিত হয়। উহা প্রাকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতি প্রসূত। প্রকৃতিই সেই সেই প্রকারের প্রভেদ জন্মায়। যাঁহারা অনন্যচিত্তে প্রকৃতিপুস্তক পাঠ করেন, তাঁহারা বলেন ও বুঝেন, মনুষ্য জাতির অবান্তরে বিশেষ বিশেষ জাতিভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বিষয়ের ঋষি-সম্মত নিকর্ষ এই যে, মনুষ্যজীব সামান্যতঃ এক হইলেও ইহাদের অন্তর্গত প্রভেদ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। আর্য্য ও অনার্য্য। আর্য্য জাতির মধ্যে প্রাকৃতিক ভাবান্তর বা প্রভেদ প্রধানতঃ চার প্রকার এবং অনার্য্য জাতির অবান্তর ভেদ অনেক। এদেশের পুরাতন গণকাচার্য্যেরা কোষ্ঠীগণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহ ব্রাহ্মণজাতির, মঙ্গল ও সূর্য্যগ্রহ ক্ষত্রজাতির, চন্দ্র বৈশ্য জাতির, বুধ শূদ্রজাতির ও শনি অন্ত্যজ জাতির অধিপতি। এইরূপ জাত্যধিপতি কল্পনা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণজাতীয় দেহের সহিত বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের যেরূপ ফলদাতৃত্ব সম্বন্ধ, ক্ষত্রাদিজাতীয় দেহের সহিত সেরূপ ফলদাতৃত্ব-সম্বন্ধ নহে। এতদনুসারে তাঁহারা যে কোষ্ঠীতে ফলাফল হওয়ার কথা বলেন, সে সকল প্রায়শঃ সত্য বৈ মিথ্যা হয় না। গণনার সত্যতা দৃষ্টে আমাদের মনে হয় বর্ণিত প্রকারের জাতিভেদ প্রকৃতি কর্তৃকই ব্যবস্থিত, লোক কল্পনায় ব্যবস্থিত নহে।

এই প্রসঙ্গে আর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে অকৃতদার ব্রাহ্মণের ঔরসে উৎপন্ন সন্তানের বর্ণসঙ্করত্ব জন্মে কি না। এ প্রশ্নের সমাধান অন্য প্রস্তাবে অনুসন্ধেয়।

যাঁহারা জাতি নির্ব্বাচক ঋষি, তাঁহারা বলেন, ব্যভিচার, ঋতুদোষ, জাতীয় ধর্ম্মের

ও কর্ম্মের পরিত্যাগ ও উৎকট সংসর্গ প্রভৃতি নানা কারণে সঙ্করবর্ণ অর্থাৎ বিকৃত জাতির উৎপত্তি হয়। জাতিগত বিকৃতি প্রথম প্রথম ব্যক্তিগত থাকে, পরে সেই বিকৃতির অনুবৃত্তি হওয়ায় ক্রমে তাহা বংশগত হইয়া পড়ে। পরন্তু ইদানীং কালে তাহার আর নির্ব্বাচন হয় না। না হইলেও বুঝিতে হইবে, চিরকালই বিশেষতঃ এখন বিখ্যাত বর্ণসঙ্কর ও প্রচ্ছন্ন বর্ণসঙ্কর, এই দ্বিবিধ বর্ণসঙ্কর জনসমাজে বাস করিত ও করিতেছে। "প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যা স্বকর্ম্মভিঃ।" কলিধর্ম্মপ্রস্তাবে লেখা আছে, কলিশেষে পৃথিবী প্রখ্যাত ও প্রচ্ছন্ন এই দ্বিবিধ বর্ণসঙ্করে পরিপূর্ণা হইবে। প্রস্তাবের শেষ নিকর্ষ এই যে, যদিও আমরা শাস্ত্র ও যুক্তি অমান্য ও অগ্রাহ্য করি, তথাপি জাতি বিষয়ে একটী প্রত্যক্ষীকৃত পরীক্ষা স্বীকার করিতে বাধ্য। পরীক্ষাটি এই :—

দেখা যায়, দীর্ঘকাল কলসে প্রপূরিত থাকিলে গঙ্গাজল ব্যতীত আর সমুদায় জলে কীট জন্মে। এক স্থানে ও একই সময়ে, কোন এক শুদ্ধজাতীয় মানব এক কলসী ও অস্পৃশ্যজাতীয় মানব এক কলসী গঙ্গাজল আহরণ করিয়া রক্ষিত করুক। তিনি চার মাস বা ততোধিককাল পরে দেখিবেন, অস্পৃশ্য জাতির সংস্থাপিত কলসে কীট জন্মিয়াছে, পরন্তু স্পৃশ্যজাতির আহৃত কলসে কীট জন্মে নাই। এই ঘটনা দেখিলে আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, মানব জাতি এক হইলেও তাহাদের অবান্তরে অত্যন্ত প্রভেদ আছে। যাঁহারা ঐরূপ কীট জন্ম পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই, প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহারা হয় ত বলিবেন, গঙ্গা জল কেন স্রোতের জলেও কীট জন্মে না। তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ—পরীক্ষা করুন দেখিতে পাইবেন, এক মাত্র গঙ্গাজল ব্যতীত, আর সব জলে কীট জন্মে। এই প্রসঙ্গে আমরা স্পর্শ ঘটিত দুই চারিটী বিষয়বিকারের উল্লেখ করি, তদ্দ্বারা বুঝিতে পারিবেন, বিশেষ বিশেষ পদার্থের বিশেষ স্পর্শ বিশেষ বিশেষ পদার্থে কোন না কোনরূপ বিকার উৎপাদন করে।

কোন্ পদার্থের কিরূপ স্পর্শ, কোথায় কিরূপ ক্রিয়া ও বিক্রিয়া জন্মায়, তাহা আমরা জানি না। আমরা কেন, বোধ হয় কোনও মনুষ্য স্পর্শরহস্যের সমগ্র মহিমা জ্ঞাত নহেন। লজ্জালু নামক উদ্ভিদ্ বায়ু প্রভৃতি নির্জীব পদার্থের তাড়না অনায়াসে সহ্য করে, ভেক ও জলৌকা প্রভৃতি সজীব পদার্থেরও আক্রমণ সহ্য করে, অথচ মনুষ্য জীবের অতি যৎসামান্য স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। স্পর্শমাত্রেই সংকুচিত ও ম্রিয়মান প্রায় হইয়া পড়ে।

কেন্নো-নামক কীটজাতীয় জীব আপন ইচ্ছায় বেড়ায়, তৎকালে তাহাদের গাত্রে নানা প্রকার পদার্থ স্পৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহাদের কোন প্রকার বিকৃতি জন্মে না। কিন্তু যদি দৈবাৎ মনুষ্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা গাত্র সংকোচ দ্বারা কুণ্ডলীকৃত হইয়া পড়ে।

গোয়ালারা বলে, দধি পাতার পর কিছু সময় তাহা ছুঁইতে নাই। ছুঁইলে অর্থাৎ স্পর্শ করিলে, দধি ভাল হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। ইহা ছাড়া আরও অনেক স্পার্শিক বিকারের স্থান আছে, সে সকল দেখিলে ও শুনিলে যবনস্পৃষ্ট গঙ্গাজলে কীটোৎপত্তি হওয়ার সংবাদ অবিশ্বাস্য হইতে পারে না। শেষ কথা এই যে, গঙ্গাজলের ঐ তথ্য টুকু মুনি ঋষিদিগের অভিমত জাতিভেদের প্রাকৃতিকত্ব পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে সমর্থ।

পূর্ব্বকালে, বর্ণিত পাঁচ বর্ণের পরস্পর ব্যাভিচারে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তাহারা পৈত্রিক ও মাতৃক জাতীয় লক্ষণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল অর্থাৎ কোন কোন অংশে কিছু কিছু বিকৃত হইয়াছিল। তাই তাহারা বর্ণশঙ্কর জাতি বলিয়া তৎকালের লোক সমাজে প্রথিত হইয়াছিল। ব্যভিচারজাত মনুষ্যের সাঙ্কর্য্য ভাব প্রথমতঃ ব্যক্তিগত থাকে। তৎপরে ক্রমিক সন্তান পরম্পরা ধারা সেই সাঙ্কর্য্য প্রবাহিত হইয়া বংশগত হইয়াছিল। ক্রমে সেই সকল সঙ্কর জাতির বিশেষ বিশেষ শ্রেণী পৌর্ব্বকালিক সমাজের বিচারে অবধৃত হইছিল; পরন্তু এখন আর তাহা হয় না। অর্থাৎ এখন যতই বিকৃত জন্ম হউক না কেন, তাহা হইতে এখন আর কোনরূপ অভিনব জাতির বা অভিনব শ্রেণীর ব্যবস্থা করা হয় না। এই বিষয়ে আমরা এইরূপ বুঝি যে, যখন গো অশ্ব কুকুর প্রভৃতি পশুজাতীয় জীবে, পারাবত প্রভৃতি পক্ষিজাতীয় জীবে ও কাইন্ প্রভৃতি মৎস্যজাতীয় জীবে বিজাতীয় সঙ্গম জনিত বৈলক্ষণ্য জন্মিবার নিয়ম দৃষ্ট হয়, বীজ ক্ষেত্রের ব্যভিচারে শস্য ফলাদিরও ভাবান্তর জন্মিবার নিয়ম দৃষ্ট হয়, তখন যে ঐরূপ একটা নিয়ম মনুষ্য জীবেও আছে, সে পক্ষে সংশয় নাই। তবে কি না, ঐরূপ জাত্যন্তরাপত্তি-নিয়ম পশ্বাদি জীবে যতটা বিস্পষ্ট, মনুষ্য জীবে ততটা বিস্পষ্ট নহে এইমাত্র প্রভেদ।

পুরাণ পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বকালে বেণ রাজার রাজ্যশাসনকালে এই ভারতবর্ষে বিস্তর বর্ণসঙ্কর জাতি জন্মিয়াছিল। যথাঃ—

"অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি॥
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিঃ প্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ॥
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ॥"

শ্লোক কয়েকটীর সারার্থ এই যে, পশুর ধর্ম্ম দ্বিচারিণীত্ব। মনুষ্যের পক্ষে তাহা অতি গর্হিত। পুরাকালে বেণ রাজা মৃতপতিকা নারীদিগকে পত্যন্তর গ্রহণ করাইতেন। তাই তৎকালে বিস্তর বর্ণসঙ্কর জাতি জন্মিয়াছিল। সেই হইতে সাধু লোকেরা এইরূপ বলিয়া আসিতেছেন যে, মৃতপতিকা নারীকে পত্যন্তর গ্রহণ করান অতীব গর্হিত।

এস্থলে "পতি মরিলে পত্যন্তর গ্রহণ" এই প্রসঙ্গে অন্য একটী কথা উত্থাপিত হইল। বেণ রাজার সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, আজকাল দেখা যায়, প্রায় সেইরূপ চেষ্টা হইতেছে। হয় হউক, ভালই, পরন্তু শাস্ত্রের দোহাই কেন? শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ঐ কার্য্য করিতে হইলে, আরও চারিটী স্থলে পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা করা উচিত বলিয়া গণ্য হইবে। পত্যন্তর গ্রহণের শাস্ত্র ত এই ঃ—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

নষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘকাল অদর্শন। মৃত অর্থাৎ মরিয়া যাওয়া। প্রব্রজিত অর্থাৎ গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করা। ক্লীব অর্থাৎ রতিশক্তি নষ্ট হইয়া যাওয়া। পতিত অর্থাৎ মহাপাপজনক মদ্যপানাদি, অভক্ষ্য ভক্ষণাদি ও দীর্ঘকালব্যাপী ম্লেচ্ছসংসর্গাদি করা। পতি এই পাঁচ প্রকারের কোন এক প্রকার হইলে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ ও অন্য পতি গ্রহণ করিবেক। পরাশর ঋষির ব্যবস্থা চালাইতে হইলে, সমুদায় স্থলে বচনের দোহাই দিতে হইবে। নচেৎ কেবলমাত্র বিধবাকে পত্যন্তর গ্রহণ করাইলে শাস্ত্র মান্য করা হইবে না।

এই প্রস্তাবের সকল অংশে আমরা সায় দিই না।
সহ সং।

প্রকাশ রূপ।

কার শক্তি বিশ্ব-মূলে থাকি বিদ্যমান,
জল স্থল শূন্যোপরি জাগাইছে প্রাণ।
ফুটাইছে জীবনের অনন্ত মুকুল,
চরাচর বিশ্ব যার সৌরভে আকুল।
কার তেজ রস রূপে ব্যাপিয়া ভুবন,
সঞ্চারিত করি সবে অমৃত-চেতন,
খুলি দেয় মরমের নিভৃত দুয়ার
তুলিয়া বিচিত্র সুরে চেতনা ঝঙ্কার।
কার যোগে মুক্তি-লোকে প্রবেশি মানব,
জীবনের সর্ব্ব ভার করিয়া লাঘব,
ব্যাপ্ত করে আপনারে চরাচর ময়
নাহি থাকে বাধা তার নাহি থাকে ভয়।
কোথা সে প্রকাশ রূপ আদি অন্ত হীন
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার বক্ষ মাঝে লীন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রার্থনা।

১

তুমি দেব দয়াময় করুণা নিলয়,
সূর্য্যমুখী রবি পানে যথা চেয়ে রয়।
যেমতি সতীর প্রাণ রহে পতি পানে,
তেমনি রহিও জাগি ভক্তের পরাণে।

তোমারে কাতরে নাথ ডাকি অনিবার,
সুখ, দুঃখ, শান্তি, শ্রান্তি, বাসনা আমার
সকলি মিলিয়া যেন তব পানে ধায়,
তুমি হও সরবস্ব এ দীন হিয়ার।

যেন ধর্ম্ম ভক্তি মোরে নাগিনীর পাশে
বাঁধেনাক, মোর এই শোণিতে নিঃশ্বাসে
যেন প্রবাহিত হয়, সরল সুন্দর
হয় যেন জগদীশ বিশ্ব চরাচর।

শুদ্ধ নিরমল হোক হৃদয় আকাশ,
তুমি তাহে দীপ্ত রবি রহ সুপ্রকাশ।

২

দয়া কর জগদীশ দয়া কর মোরে,
তুমি মোর এক মাত্র সার।
হৃদয়ের মাঝে মোর মনের মন্দিরে,
আর কারো স্থান নাই আর।
তোমারে স্থাপিয়া চিত্তে নিখিল দেবতা
দিবা নিশি পূজিব চরণ,
কণ্ঠের মালিকা দলে তুমি যে মুকুতা
তোমারে করিব আভরণ।
সেই কণ্ঠ-হার শুধু জ্যোতিরাশি ভরা
হৃদয়ে করিবে ঝলমল,
ওই জোতি সুধা পিয়ে আমি আত্মহারা
তোমাতেই রহিব বিভল।

৩

শতেক সুখের মাঝে সহস্র বন্ধনে,
নিশি দিন রাখি তোমা জাগায়ে স্মরণে।
শত সুখ হতে তুমি সুখ শ্রেষ্ঠতর,
জীবনে মরণে করি তোমাতে নির্ভর।
এক মাত্র শিক্ষদাতা ভরসা আমার,
তুমিই দেবতা মম ধ্যান ধারণার।
কর শুভ্র পুণ্যময় এ মোর হৃদয়,
সমস্ত জীবন মোর হোক তোমাময়।
আমার আপন শক্তি জ্ঞান আলো দিয়া,
কভু কি রাখিতে পারি এই ক্ষুদ্র হিয়া?
অনন্ত শকতিময় তব জ্যোতি দানে,
কেবল রক্ষিতে পার দুর্ব্বল সন্তানে।
জগদীশ তব শক্তি তব দয়া দিয়া,
কর পরিপূর্ণ এই ক্ষুদ্র দীন হিয়া।

৪

জীবন স্বরূপ হও জীবন আমার,
তুমি মোর হও প্রাণ মন।
শুধু ধর্ম্ম ভক্তিবলে মানেনাক আর
এ অশান্ত হৃদয় এখন।
তব অনুরক্ত ভক্ত, হব এ সাধনা
মেটেনাক তাহে শুধু আর,
তাই মোর এই সাধ এই আরাধনা
তুমি হও জীবন আমার।
জীবনের বায়ু যেন, নিঃশ্বাসের সম
মিলাইয়া যেও এই বুকে,
গোপন হৃদয়তলে আত্মা যেন মম
তাহলে রহিব সদা সুখে।

শ্রীসরোজ কুমারী দেবী।

অধ্যেতার নিবেদন।*

আমরা মানুষ। মানুষ বলিলেই মনে একটি উচ্চভাবের উদয় হয়। পৃথিবীতে আরও অসংখ্য প্রকার জীব আছে। বৃহদাকার হস্তী হইতে চক্ষুর অগোচর জীবাণু, কাহারও কথা মনে হইলে কোন রূপ মহদ্ভাবের ত উদয় হয় না। সকল দেশ ও সকল যুগ মনুষ্য জন্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আসিতেছে। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ মানুষের জ্ঞান আছে। জ্ঞান বলে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়া পঞ্চ ভূতকেও অনেক পরিমাণে আপনার আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের দয়া আছে। দয়া বৃত্তির পরিচালনা করিয়া মানুষ পরোপকারের, দরিদ্র ও আর্ত্তের সেবার কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ না এই মর্ত্তলোকে স্থাপন করিয়াছে। এই সকল সন্দর্শন করিলে মনে কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হয়! এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গুণ আছে যাহার জন্য মানুষ এত বড়। সে সকল অদ্যকার আলোচ্য বিষয় নহে। ধর্ম্ম লইয়া মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ধর্ম্মের জন্যই সর্ব্বশাস্ত্রে মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অন্য কোন জীবের ধর্ম্মে অধিকার নাই। ব্রহ্মকে জানা, জানিয়া তাঁহার কার্য্য করা এবং প্রীতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উপহারে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করা কেবল মানুষেরই অনন্যসাধারণ অধিকার। ক্ষুদ্র মনুষ্য সেই অনন্ত অবিনাশী সারাৎসার দেবদেব মহাদেবকে জানিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে এবং তাঁহার সহবাসে থাকিয়া ভূমানন্দ সম্ভোগ করিতেছে। একি মহৎ অধিকার!! মানুষ ভিন্ন আর কোন জীবই তাহাদের স্রষ্টা ও পরিপোষণ-কর্ত্তাকে জানিতে পারে না। কি কর্ত্তব্য কি পরিহার্য্য তাহা বুঝিবার তাহাদের শক্তি নাই। তাহাদের কোনও দায়িত্ব নাই—পাপ পুণ্য নাই—দণ্ড পুরস্কার নাই। না জানিয়া, অন্ধ-শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা কার্য্য করে। লোভে আকৃষ্ট ও ভয়ে বিতাড়িত হয়। তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা সকল পালন করিবার এবং তাঁহার পূজা করিবার মহোচ্চ অধিকার তিনি কেবল মানুষকেই দান করিয়াছেন। এই জন্যই মনুষ্য জীব-শ্রেষ্ঠ, আর আর সকলই নিকৃষ্ট জীব।

এই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ দুর্লভ মানব-জীবন লাভ করিয়া কত আকুল নরনারী সেই ব্রহ্মকে জানিবার ও ধরিবার অভিপ্রায়ে যুগে যুগে নানা প্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির এক সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া দেবতা হইয়া গিয়াছেন। কেহ বা ঈশ্বরকে কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা জানিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন, আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কোন সাধক তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ প্রণিধান করিয়া সেই স্বরূপের সাধনা করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষিগণ জ্ঞান-যোগে তাঁহাকে "সত্যং শিবং সুন্দরং" বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন। ব্রহ্মের যে ভাবে ঋষিরা মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সত্যং শিবং সুন্দরং বলিয়াছেন, ভিকৃটর কুজেঁর হৃদয়তন্ত্রে সেই সুর বাজায় তিনি

* বিগত ৯ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের অষ্ট-পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্রবাবু উপাসনা করেন এবং শাস্ত্রী মহাশয় বেদী হইতে ব্যাখ্যান দেন। বেদীর নিম্নদেশ হইতে শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক যে উপদেশ পাঠ করেন, তাহা "অধ্যেতার নিবেদন" বলিয়া প্রকাশিত হইল।

The True, the Beautiful, the Good, বলিয়া উঠিলেন। ঈশা তাঁহাকে জগৎ পিতা বুঝিয়া পুত্র ভাবে তাঁহার সাধনা করিয়াছিলেন। শ্রী-চৈতন্যদেব প্রেম ভক্তিতে তাঁহার ভজনা করিয়া নিজে ভগবৎ প্রেমে মত্ত হইয়া সমগ্র বঙ্গ-ভূমিকে প্রেম ভক্তিরসে মাতাইয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা পরমাত্মাকে স্বামী ও জীবাত্মাকে পত্নী ভাবিয়া মধুর ভাবের সাধন করিয়াছেন। (Husband God and wife soul)। প্রোফেসর নিউম্যান বলিয়াছেন জীবাত্মা পরমাত্মাকে বিবাহ করিবে। পাণ্ডবেরা ভগবানের সখ্য ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সখা বলিয়া ডাকিয়াছেন। যোগী বুদ্ধদেব অষ্টসোপান মার্গ দিয়া সাধনা দ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ভক্ত রাম-প্রসাদ ব্রহ্মের মাতৃভাবে বিমুগ্ধ হইয়া "মা" মন্ত্রের সাধনা করিয়াছেন। আস্তিকের—"জয় জগদীশ" রব, শৈবের "শিব শম্ভু" ধ্বনি, বৈদান্তিক ঋষিদের গগনস্পর্শী "সত্যং শিবং সুন্দরং" মন্ত্রের উচ্চারণ, ঈশার বিশ্বাসপূর্ণ "পিতা পিতা" বলিয়া ডাক, প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের হৃদয়ভেদী "দয়াল হরি" নাম গান সহ নৃত্য ও ক্রন্দন, পাণ্ডবদের সহৃদয় "সখা" সম্বোধন, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাক যোগ সাধন, শাক্ত রাম প্রসাদের ব্যাকুল কাতর প্রাণে "মা মা" শব্দ, সত্য সত্যই মানুষের গণ্ডদেশে অশ্রুসিক্ত এবং প্রাণকে উদ্বেলিত ককরে। এই সকল সাধন প্রণালী সাধকের হৃদয়কে উৎফুল্ল করে, মৃত আত্মায় জীবন সঞ্চার করে এবং নিরাশা ও অবিশ্বাসকে দূর করিয়া দেয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই সকল সাধনের মধ্যে কোনটিকেই পরিত্যাগ করেন না। সকলকেই সাধনের সহকারী করিয়া লন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশুদ্ধ জ্ঞানকে প্রহরী রাখিয়া সতত সাবধানে থাকিতে বলেন, যাহাতে কোনও প্রকার কুসংস্কার ও ব্যভিচার আসিয়া সাধনাকে কলুষিত না করে। একটি সুন্দর গান আছে—

বাউলের সুর। একতালা।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে॥
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
হৃদয় বন্ধু কিম্বা পুত্র কন্যা,
তোমার এ নহে সম্ভব, এ কি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে।
ওহে, শাস্ত্রে শুনতে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে;
তুমি হবে কেউ আমার
আপনার হতেও আপনার (তোমার পানে)
আপনার না হলে মন কি টানে॥

অদ্য ভগবানের মাতৃভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবার ইচ্ছা। তাহা বড় দুরূহ ব্যাপার নহে। আজীবন যাঁহার স্নেহে লালিত পালিত ও রক্ষিত হইতেছি, তাঁহার মাতৃভাব দেখা সুকঠিন নহে। এক অক্ষরের "মা" মন্ত্র বড়ই মিষ্ট। ইহার মধ্যে সকলই আছে। পিতা শব্দে মনে তাঁহার কঠোর শাসনের ভাব আসিতে পারে, তাঁহার শাসন ও দণ্ডের কথা অন্তরে জাগিতে পারে, তাঁহার ত্যজ্যপুত্র হইবার আশঙ্কা মনে আসিতে পারে, কিন্তু "মা" নাম বড়ই অমৃতপূর্ণ। স্নেহময়ী জননীর কথা মনে হইলে, সন্তানের আত্মা মাতৃপ্রেমে গদগদ হয়। যতই দুঃখ, যতই ক্লেশ, যতই যন্ত্রণা আসুক না, মায়ের কোলে বসিলে সব জুড়ায়—সকল জ্বালার শান্তি হয়। মা কোনও সন্তানকেই ত্যাগ করেন না। তিনি আড়ালে থাকিয়া সকলই বিধান করিতেছেন। কেহ তাঁহাকে চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে পায় না। লুকাইয়া থাকিয়া তিনি সকলকে স্নেহে লালন পালন করেন। এমন মাতা আর কোথায় পাইব। অবাধ্য দুর্ব্বিনীত সন্তানের পাপ মুখে দুই বেলা

অন্ন-পান তিনি তুলিয়া দিতেছেন; কেমন করিয়া তাহাকে সৎ পথে ফিরাইয়া আনিবেন, সতত তাঁহার চেষ্টা করিতেছেন। এমন প্রেমময়ী দয়াময়ী মা আর কোথায় মিলিবে। স্বাস্থ্যে বা সম্পদে যে তাঁহাকে ডাকে না, তাহাকেও রোগে বা বিপদে ফেলিয়া সংশোধন করিতেছেন, অথচ রোগ শয্যার পার্শ্বে থাকিয়া তিনি শুশ্রূষা করিতেছেন এবং বিপদে কাণ্ডারী হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। এ কেমন মা! শোক সাগরে ডুবাইয়া নিজের দিকে টানিয়া আনেন, অথচ তিনিই আবার সান্ত্বনা দেন। তাঁহার চরণে ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিবার জন্য ভক্তের মাথায় আরও বোঝা চাপান। আমরা সংশয়াপন্ন। আমরা মনে করি মায়ের একি ব্যবস্থা। কিন্তু ভক্ত বুক পাতিয়া তাঁহার আঘাত সহ্য করেন, মাথা পাতিয়া তাঁহার বোঝা বহন করেন। শোকাশ্রু দিয়া তাঁহার পদসেবা করেন। এমন মা ত আর দেখি না। মৃত্যুর মধ্য দিয়া তিনি অমৃতেতে লইয়া যান। দুঃখী পাপী তাপী সকলে মায়ের কোলে যাইয়া শান্তি লাভ করে। আমরা তাঁহার বিধান বুঝিয়া উঠিতে পারি না, মনে করি তাঁর একি অবিচার। বুঝি না "কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।" নিজ কোলে বসাইয়া স্থায়ী ব্রহ্মানন্দ দান করিবার জন্য তিনি উৎসুক। এমন মা আর কোথায় পাইব। আহা! বিপদে শোকে মূহ্যমান হইয়া, পাপে তাপে মলিন হইয়া যদি মা মা বলিয়া ডাকিতে পারি, সকল ভাবনা তিরোহিত হয়। যদি রোগশয্যায় মাতাকে দেখিতে পাই এবং মৃত্যুর সময় মাতার কোলে ঝাঁপ দিতে পারি, তাহা হইলে আর ভয় থাকে না। জীবনে মরণে, ইহ-পরলোকে তিনিই আমাদের আশ্রয় গতি ও মুক্তি। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই মাতৃপ্রেমের ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিতে পাই। তাঁহার সেই অতুলন স্নেহ নানা আকার ধারণ করিয়া তাঁহার সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে। সূর্য্যের রজত কিরণে তাঁহারই করুণা, চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কাঞ্চন-জ্যোৎস্নায় তাঁহারই প্রেম, বায়ুতে তাঁহারই কৃপা, মেঘে তাঁহারই অমৃতবারি বর্ষণ, এই সকলেতেই তাঁহার অনুপম কৃপা। জরায়ুশয্যায় অবস্থিতি কালে সেই স্নেহই জীবের সম্বল ও একমাত্র ভরসা। মাতৃক্রোড়ে শিশুর স্তন্যপান, সেই বিশ্বজননীকেই দেখাইয়া দেয়। দম্পতির পবিত্র প্রণয়ে তাঁহারই প্রেমের পরিচয়। ভ্রাতা ভগিনীর ও বন্ধুর অকৃত্রিম অনুরাগ সেই প্রেমেরই ছায়া মাত্র। পশুদিগের সন্তান পালনে, পক্ষীর শাবককে আহার দানে সেই পরমমাতার প্রেমের চিহ্ন পাই। পৃথিবীর পিতা মাতা সেই পরমমাতারই প্রতিনিধি। তিনিই এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া মাতৃরূপে জীবের সকল প্রকার অভাব মোচন করিতেছেন।

এই উৎসবক্ষেত্রে সেই পরম মাতা বর্ত্তমান। জ্ঞাননেত্রে একবার তাঁহাকে দেখিতে হইবে। এই সকল ভক্তবৃন্দের মুখশ্রীতে সেই পরম মাতা দেদীপ্যমান। সকলের প্রাণের অভ্যন্তরে প্রাণের প্রাণকে অবলোকন করিতে হইবে। আমাদের বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে ও অধোতে, অনন্ত আকাশে সেই পরম মাতার সত্তা; আমরা সেই অনন্ত সত্তা-সাগরে—অনন্ত রূপ সমুদ্রে অবগাহন করিয়া রহিয়াছি। মানুষ তাঁহার বড় প্রিয় সন্তান। তিনি আমাদিগকে জ্ঞান ও বিবেকে সুসজ্জিত করিয়া, স্বাধীন করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন যে তাঁহাকে জানিয়া বুঝিয়া দেখিয়া প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা দিয়া তাঁহার

পূজা করিব। স্বাধীন মানুষের স্বেচ্ছাদত্ত প্রেমবিন্দু তিনি বড়ই ভাল বাসেন। তিনি আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের স্রষ্টা পাতা পরিপোষণ-কর্ত্তা পরিত্রাতা হইয়া আমাদের নিকট একটু প্রীতি একটু ভক্তি একটু কৃতজ্ঞতা চাহিতেছেন। আর আমরা কি তাঁহাকে তাহা দিতে কাতর হইব? আজ সেই পরম-মাতা আমাদের দ্বারে উপস্থিত। আর কিছুই চান না। কেবল এক বিন্দু প্রেম, এক বিন্দু কৃতজ্ঞতা চাহিতেছেন। তাহাও না দিয়া তাঁহাকে কি ফিরাইয়া দিব? যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, সকল ঐশ্বর্য্যের স্বামী, যাঁহার সদাব্রত আমরা চিরজীবন উপভোগ করিতেছি, তিনি আমাদের দ্বারে উপনীত! যাঁহার ভাণ্ডার অন্ন পানে পরিপূর্ণ, ভিক্ষার্থী হইয়া তিনি আমাদের হৃদয়-কুটীরে দণ্ডায়মান। আমরা প্রেমের একমুষ্টি ভিক্ষা না দিয়া রিক্তহস্তে কি তাঁহাকে বিদায় দিব? কখনই না। আমাদের প্রেম ভক্তির যাহা কিছু আয়োজন আছে, তাহা তাঁহাকে দিতে কৃপণতা করিব না। আমাদের মধ্যে যিনি বিনা আয়োজনে আসিয়াছেন, এইক্ষণেই ভক্তিপুষ্পহার গাঁথিয়া হৃদয়-থাল ভরিয়া মায়ের চরণে অর্পণ করুন।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের নিকট কত ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাক। সেই জন্য সাধকেরা নানা সময়ে নানা নামে তোমাকে ডাকিয়া থাকেন। আমরা এখন তোমার মাতৃভাব দেখিয়া আজ তোমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি। হে বিশ্বজননী! হে জগন্মাতা! হে আমাদের প্রতিজনের মা! আমরা তোমার অতি দীন হীন কাঙ্গাল সন্তান। আমরা সাধন জানি না, ভজন জানি না। আমাদের এমন কোন সম্বল নাই, যাহা দিয়া তোমাকে পরিতুষ্ট করিতে পারি। সকল সময় ত তোমাকে দেখিতে পাই না। আজ শুভ মুহূর্ত্তে এখানে তোমার দর্শন পাইব, এই আশায় বহু যত্নে কয়েকটি প্রীতি-কুসুম আনিয়াছি। প্রেমাশ্রুতে তোমার পদ প্রক্ষালন করিয়া, ভক্তিচন্দনে সেই ফুল চর্চ্চিত করিয়া আজ তোমার চরণে অঞ্জলি দিতেছি। তুমি কৃপা করিয়া গ্রহণ কর এবং আমাদিগকে কৃতার্থ কর—ধন্য কর। করজোড়ে অবনত মস্তকে তোমার নিকট এই প্রার্থনা।

উপদেশ।

ভবানীপুর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ। হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎই বর্ত্তমান ছিলেন। এই কথা বলিয়া বেদের ঋষি পুনরায় বলিলেন 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তিনি একই অদ্বিতীয়। এই অকাট্য সর্ব্বজন সম্মত সত্য ঋষির অন্তর্ভেদ করিয়া কেমন সরল সহজ ভাবে বহির্গত হইল। সৃষ্টির বিচিত্রতা দর্শন ও সৃষ্টির তত্ত্ব-রহস্য অনুভব করিয়া পরবর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া গেলেন যে, না সতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যিনি তত্ত্বদর্শী, তিনিই জানেন যে কারণ সৎ না হইলে কার্য্যরূপ সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। সৎ বলিলে সৃষ্টি-স্থিতির অতীত বস্তুকে বুঝায়। কিন্তু কেবল এই সৎবস্তুর উপলব্ধি মাত্রেই সাধকের প্রাণের পিপাসা মিটে না। তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বুঝিতে হইবে, এবং সেই পুরুষের উপাসনা করিয়া মুক্তির প্রার্থী হইতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবের মুক্তির জন্য সেই মহান্ পুরুষের উপাসনা বিধি প্রচলিত করিয়াছেন। কিন্তু এই পুরুষ কল্পনা-প্রসূত কোন মূর্ত্তি হইলে চলিবে

না। যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, যিনি সৃষ্টির কারণ, যিনি সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছেন, যিনি সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া রহিয়'ছেন এবং ব্যক্তিগত তিরোভাব কালে, খণ্ড প্রলয়ে এবং মহাপ্রলয়ে যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সকলে অমৃত পান করে, তাঁহাকে চাই। তাঁহাকে না পাইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িবেন না, ব্রাহ্মধর্ম্মের আগমন সিদ্ধ হইবে না। মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্য মেঘ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইলে সে যেমন সেই সূর্য্যই, তেমনি মোহাচ্ছন্ন বৈদিক যুগের ঋষিদিগের পরিদৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান ভ্রান্তি জাল-ভেদ করিয়া যে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা যথার্থই ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা সত্য। এ পরম সত্যকে যদি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, যদি আমাদের বিশ্বাস তাহাতে না যায়, যদি আমাদের গৃহে পরিবারের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা না দিতে পারি, তবে সত্যই আমাদের দুর্ভাগ্য। ভারত ভূমি ধর্ম্ম-প্রসূ বলিয়া পৃথিবীতে যে গৌরব লাভ করিয়াছে তাহা এজন্য নহে যে, পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যে সাধারণ ধর্ম্মনীতি বর্ত্তমান, যে, সত্য কথা বল, পরদ্রব্য হরণ করিও না, হিংসা করিও না; কেন না ইহা সকল জাতিরই ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যদিগের হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছে, সমাজে শৃঙ্খলারক্ষা করিবার জন্য, পুণ্য ও পবিত্রভাবে সংসার ধর্ম্ম পরিচালনার জন্য। ইহাতে সংসার গতি নিবারণ হয় না, ইহাতে শাশ্বত আনন্দময় মুক্তি লাভ হয় না। ভারতের গৌরব এখানে নহে, ব্রাহ্মের গৌরব এখানে নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন মুক্তি—যে মুক্তি লাভ করিলে মানবের সংসার গতি নিবৃত্ত হয়, পুনঃ পুন জন্মগ্রহণের জ্বালা নিবারণ হয়। পুণ্যেন পুণ্যংলোকং নয়তি পাপেন পাপং। পুণ্যের দ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় আর পাপ দ্বারা পাপলোক। কিন্তু পুণ্যের দ্বারা যতই উন্নত লোক প্রাপ্ত হই না কেন, তাহা তো লোক ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেখানেও যন্ত্র ধারণ করিতে হয়। যন্ত্রের যে দুঃখ তাহার আস্বাদন আমরা এই পৃথিবী লোকেই লাভ করিলাম, তবে আর কেন লোক-কামনা? এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম লোক-কামনা পরিহার করিতে বলিতেছেন এবং সেই মহান্ পুরুষের উপাসনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার উপদেশ দিতেছেন। ব্রহ্মই আমাদের লোক। ঋষিরা তো পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন—

> স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম
> যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রং।
> উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে
> শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ॥

যাঁহাতে আশ্রিত হইয়া এই সুন্দর বিশ্বজগৎ শোভাধারণ করিতেছে, সাধক সেই ব্রহ্মলোককে জানেন। যাঁহারা নিষ্কামভাবে সেই পুরুষের উপাসনা করেন সেই ধীরেরা জন্ম মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। ব্রহ্ম-পুরুষের উপাসনায় মুক্ত হয়। ব্রহ্মপুরুষের লক্ষণ কি? এই কথা বুঝিবার পূর্ব্বে মানব-পুরুষের লক্ষণ কি তাহা আমাদিগের বুঝিতে হইবে। মানব পুরুষ চক্ষুর দ্বারা দেখে, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে, নাসিকার দ্বারা আঘ্রাণ লয়, জিহ্বার দ্বারা রসাস্বাদন করে, মনের দ্বারা মনন করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে কর্ম্মে নিয়োগ করে। মানব-পুরুষ নিজের শরীরের—নিজের সংসারের কর্ত্তা। সে ইন্দ্রিয়গণ-গুণে গুণান্বিত, আর ব্রহ্মপুরুষ? ব্রহ্মপুরুষ "সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ।" সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের প্রকাশক কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। বিশ্বের

কর্ত্তা, বিশ্বের নিয়ন্তা, সকলের আশ্রয় এবং সকলের সুহৃৎ। আপনার কর্ত্তৃত্ব ভাব দ্বারা বিশ্বকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে হইবে, আপনার প্রভুত্বের ভাব দ্বারা বিশ্বপ্রভুর প্রভুত্ব বুঝিতে হইবে, আপনার আশ্রিত বাৎসল্যের ভাব দ্বারা এবং হৃদ্গত সৌহার্দ্দের দ্বারা সেই বিশ্ব-কারণ এবং বিশ্ব-বন্ধুকে বুঝিতে হইবে। যে হেতুক "সনো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা" তিনি আমাদের বন্ধু তিনি আমাদের জনয়িতা এবং তিনিই বিধাতা। তাঁহাকে ছাড়িয়া কি আমাদের কোন্ কাজ চলে? ইহা পরম সত্য যে, তিনি আমাদের চক্ষুর চক্ষু ব লিয়াই চক্ষু দেখে, কর্ণের কর্ণ বলিয়াই কর্ণ শ্রবণ করে, মনের মন এবং প্রাণের প্রাণ বলিয়াই মন মনন করে, প্রাণ প্রাণন করে ও আমরা বাঁচিয়া থাকিয়া সংসারে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হই। এবং "নহিত্বদারে নিমিষশ্চনেশে" তাঁহা হইতে ক্ষণ মাত্র দূর হইলেই আমাদের জীবন অচল হয়, জীবনশূন্য হয়। তবে কি আমরা এমন বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কল্পনা প্রসূত মৃৎ পাষাণেই তাঁহার পূজা করিব? প্রখর বুদ্ধি ও শক্তি সম্পন্ন ধর্ম্ম-প্রাণ মনুষ্যদিগকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে পূজা করিব? এত হতচেতন, এত মোহ মুগ্ধ হইয়া আমরা কি সংসার স্রোতেই চিরকাল ভাসমান থাকিব? না। "উত্তিষ্ঠত" উঠ "জাগ্রত" জাগ এবং প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকটে গিয়া জানিতে চেষ্টা কর। তুমি যে মনে করিয়াছ অতি সহজেই ধর্ম্মের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবে, বিনা সাধনে, বিনা শিক্ষায় ব্রহ্মজ্ঞানের পথে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে, তাহা হইবে না; যে হেতুক, "ক্ষুরস্যধারা নিশিতাদুরত্যয়া দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়োবদন্তি"। তত্ত্ববিদেরা বলিয়াছেন যে, এপথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় শাণিত এবং অতি দুঃখে অতিক্রমনীয় বলিয়া অত্যন্ত দুর্গম।

দেখিতে পাই যে বহু পরীক্ষোত্তীর্ণ বা বহু শাস্ত্রগ্রন্থী জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া তর্ক বলে স্বমত স্থাপনেই গৌরব বোধ করেন, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় ব্রহ্মপরায়ণ ধীর পুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, "হবে কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তাঁহাকে না পাই"। তাঁহাকে পাওয়া চাই, তবে জীবন কৃতার্থ হইবে, তবে মুক্তির সোপানে আরোহণ করি.ত পারিবে। মুক্তির জন্য আত্মজ্ঞান চাই, আত্মজ্ঞানই জ্ঞান, আত্মজ্ঞানই আলোক যাহাতে তাঁহাকে দেখা যায় এবং পাওয়া যায়। এই খানেই সেই বিন্দু—সেই জ্ঞান-বিন্দুর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িতেছে, যে জ্ঞান পূর্ণতায় বিন্দু নহে, অনন্তত্বে বিন্দু নহে, শক্তিতে বিন্দু নহে, ঘনতায় বিন্দু নহে, কিন্তু যাহাতে সমস্ত বিশ্ব নিঃশেষিত রহিয়াছে, যাহা সকল বৈচিত্রের এক আয়তন, সকল শক্তির এক উৎস, সকল জ্ঞানের এক প্রতিষ্ঠা। তাঁহাকে বিন্দুই বল বা মহৎই বল তাঁহাতে সকল দিগন্ত অন্তবৎ হইয়া প্রবিষ্ট রহিয়াছে, সকল বিশ্ব-শোভা তাঁহাতেই প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। তিনিই সৎ—তাঁহাতেই সৃষ্টি, তাহাতেই স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া পরিবর্ত্তনশীল জগতের বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতি মনের ধারণা স্থির করাও যা, আর মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করাও তাহা। এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়াই মহাতত্ত্বজ্ঞ উদ্দালক ঋষি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং।" ইনিই সকল জীবাত্মার মধ্যস্থিত এক পরমাত্মা। এই পরমাত্মার উপাসনা বিধি

প্রচলিত করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। ইহার মূলে মঙ্গল, ইহার মধ্যে মঙ্গল, ইহার অন্তে মঙ্গল। যদি মঙ্গল চাও তবে মঙ্গলময়ের শরণাপন্ন হইতে কালবিলম্ব করিও না। যদি বল এই মঙ্গলময়ের উপাসনা করিলে কি আমার অন্ন বস্ত্রের দুঃখ ঘুচিবে, ব্যাধি কি আমাকে আক্রমণ করিবে না, জরা কি আমার শরীরকে জীর্ণ করিবে না, মৃত্যু কি আমাকে লইয়া পলায়ন করিবে না? ইহার উত্তর এই যে, হাঁ, তাহারা সবই সব করিবে কিন্তু "রসপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" ইহাদের যে রস অর্থাৎ জ্বালা সেই পরম পুরুষকে দেখিবা মাত্র নির্ব্বাণ পাইবে। চিত্তে তিনি ভীষণং ভীষণানাং রূপে, চিত্তে তিনি কর্ত্তারূপে, চিত্তে তিনি গতি রূপে, চিত্তে তিনি শান্তিরূপে আনন্দ রূপে বর্ত্তমান, আর তুমি তাঁহাতে ডুবিয়া রহিয়াছ। তোমার উপর দিয়া সংসারের যত তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে তোমাকে আঘাত না করিয়া। এমন শান্তির আলয়, মঙ্গলের আলয় আর কি আছে, যেখানে সব কুহক নিরস্ত হয়? আহা, ভাগবৎ কি পরম হিতকরী উপদেশই দিয়া গিয়াছেন—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞ স্বরাট্।
তেনে ব্রহ্ম হৃদায় আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

যিনি সৃষ্টবস্তু মাত্রেই বর্ত্তমান আছেন বলিয়া ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে এবং অবস্তুতে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া তৎ সমুদায়ের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে না, সুতরাং যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়েন, সেই বেদ যিনি আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্প মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং তেজ, জল বা মৃত্তিকাদিতে অন্যবস্তুর যেমন ভ্রম হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যভাব হইতে স্বত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি, ভুত ইন্দ্রিয় ও দেবতা বস্তুত মিথ্যা হইয়াও সত্য রূপে প্রতীত হইতেছে, অথবা তেজে জল ভ্রমাদি যে রূপ বস্তুত অলীক, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা এবং যিনি আপনাতে আপনি বিরাজমান, যাঁহাতে সমস্ত কুহক নিরস্ত হইয়াছে, সেই সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি।" গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা সেই ধীশক্তি পরম পুরুষকে ধ্যান করিবার অধিকার তোমার, সত্যং জ্ঞানমনন্তং মন্ত্রে পরমাত্মাতে চিত্ত সমাধান করিবার অধিকার তোমার। বল এই সকল অধিকার হইতে আমরা কি বঞ্চিত থাকিব। পরমাত্মজ্ঞানের দীপশিখা কি আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করিয়া অন্ধকার দূর করিব না? সেই সত্য স্বরূপকে আমাদের গৃহদেবতা করিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যায় তাঁহার পূজা করিব না? দেবগণ এবং ঋষিগণ অনিমিষ লোচনে যাঁহার প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া বিমুগ্ধ রহিয়াছেন, সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে আমরাও তাঁহারই অমৃত পান করিয়া অমর হইব, ইহাই আমাদের আশা এবং ইহাই আমাদের অধিকার। হৃদ্‌পদ্মাসনস্থ সেই পরব্রহ্মকে জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিয়া প্রীতি-পুষ্পে তাঁহার পূজা করিলে মনুষ্যের মুক্তি হয়, তাঁহার আখ্যানে শাশ্বত জীবন লাভ হয়। নানক বলিয়াছেন, "আখাজীবা বিসরে মর যাও" তাঁহার আখ্যানেই জীবন এবং তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেই মৃত্যু।" আওখন আখা সাঁচা নাম সাঁচা নামকি লাগে ভুক্, ও খাবে সো তরিয়াবে দুখ।" যদি কাহারও

আখ্যান করিবে, তবে সেই সত্য নামেরই আখ্যান কর। যদি সত্য নামের ক্ষুধা হয়, তবে তাহা খাও, খাইলে সব দুঃখ দূর হইবে। যাঁহার নাম সত্য, তিনিই সত্য পুরুষ। এই পুরুষে বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা স্থিতি করিতেছেন।

> বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
> প্রাণাভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
> তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য
> স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ॥

হে সৌম্য, জীব, সমুদয় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ ও ভূত সকল যাঁহাতে স্থিত; সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনি সবই জানেন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন।

অদ্য আমাদের অষ্টপঞ্চাশত্তম ব্রহ্মোৎসবের রজনী। অদ্য এখানে দীপাবলীর শোভা, পুষ্প-স্তবকের বিকশিত মাধুরী দেখিতেছি, ঐ মধুর ব্রহ্মসঙ্গীতে কর্ণ শীতল হইতেছে। আর এই বিদ্বন্মণ্ডলীর মুখশ্রীতে কি শোভা, কি প্রতিভা পরিলক্ষিত হইতেছে। তথাপি কে যেন গোপন স্বরে বলিতেছে, ইহাতে প্রাণ কৈ? যিনি মানবকে ধী প্রদান করেন, তিনি যদি ধী দ্বারা পরিদৃষ্ট না হইলেন, তবে সে মানবকে প্রাণবন্ত বলিতে পারি না, যিনি প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ এবং আত্মার শান্তি, তিনি যদি তাহাতে বিরাজ না করিলেন তবে সে প্রাণ মন আত্মাকে জীবন্ত বলিতে পারি না। এক দিন যাহা ছিল পর দিন যদি তাহা না থাকে, তবে তাহাকে প্রাণবন্ত বলিতে পারি না। এক দিন ছিল যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আসিয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মের উপাসনা ও ব্রহ্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এক দিন ছিল যখন এই গৃহ হইতেই ব্রহ্মচারীগণের প্রতি প্রশ্ন উঠিত যে, ১, অন্তর্দৃষ্টি কি? বুঝাইয়া দাও। ২, সাধারণ মনুষ্য জাতির মধ্যেই আত্মজ্ঞান আছে, ইহা সপ্রমাণ কর। ৩, আত্মজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের কি রূপ সম্বন্ধ। ৪, সেই ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান-জ্যোতি নির্ব্বাণ হয় কিসে? পাপাচরণ দ্বারা, অসদ্ভাব দ্বারা, কুতর্ক দ্বারা, এই স্থানটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও। ৫, অন্তর্বাহ্যে বিশ্বরূপ কার্য্যের আলোচনা কি? ৬, আত্মার পরিমিত ভাব হইতে কোন পরিমিত আশ্রয়কে মনে না হইয়া অনন্ত অপরিমিতকে মনে হয় কেন? আর ব্রহ্মচারীগণ এইরূপ কঠিন ধর্ম্মবিজ্ঞান সকলের সহজ উত্তর দানে আচার্য্যকে পুলকিত করিতেন। আজ কৈ সে ধর্ম্ম বিজ্ঞান, কৈ সে প্রবীন ব্রহ্মচারীবর্গ যাঁহারা আর্য্যকুলতিলকরূপে এই ব্রহ্মমন্দিরে আর্য্য ধর্ম্মতত্বের আলোচনায় ইহাকে জীবন্ত করিয়াছিলেন? কোথায় বা নবীন ব্রহ্মচারীবর্গ যাঁহারা প্রাচীনদিগের স্থান অধিকার করিয়া এই ধর্ম্ম মন্দিরের স্তম্ভরূপে ইহাকে ধারণ করিয়া থাকিবেন। এখনো যে দুই একটি ক্ষীণ দীপ-শিখা এই গৃহে আলোক প্রদান করিতেছেন তাঁহারা তো নির্ব্বাণ প্রায়। সেই নিরাশার মধ্যেও আশা এই যে সেই প্রাচীন ব্রহ্মচারীবর্গের এক জন বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী এই উৎসবের উৎসাহদাতা হইয়া অদ্যকার উৎসবে আমাদিগকে উৎসাহ দান করিলেন। পূর্ব্বকার ব্রহ্মচারীগণের সংক্ষেপ নাম—শি, ক, মল্লিক; ব্র, না, চক্রবর্ত্তী; র, মা, ঘোষ; শী, চ, মুখোপাধ্যায়; প্রি, না, মল্লিক। ইহাঁদের এখনো যাঁহারা এই ভবধামে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, যদি তাঁহাদের সমবেত হস্ত পুনরায় এই ব্রহ্মকার্য্যে নিযুক্ত হয়, আমাদের আশা জাগ্রত হইবে, এই ব্রাহ্মসমাজ প্রাণবন্ত হইবে। ব্রাহ্মসমাজের

প্রথম প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় সমুদ্র পারে এবং তথা হইতে ব্রহ্মধামে যাইবার পর যত দিন না তাহার দ্বিতীয় প্রবর্ত্তক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আসিয়া ইহার কর্ণধার হইলেন, ততদিন যেমন আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকট চির ঋণী, সেইরূপ এই ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সকল সুহৃৎ যখন কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন, তখন ইহার সূত্রকে যিনি ধারণ করিয়া এখনো জীবিত রহিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিকটে তদ্রূপ ঋণী। তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ অতি বৃদ্ধ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি প্রয়াণের পথে পদার্পণ করিয়া ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এস ভাই, আজ আমরা তাঁহার জন্য সমস্বরে এই কল্যানবাণী উচ্চারণ করি যে—

"স্বস্তিবঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ।"

এই অন্ধকারের পরপারবর্ত্তী সেই জ্যোতির্ম্ময়ধামে যাইবার পথে তোমার কল্যাণ হউক।

নানা কথা।

দেবালয়। বিগত ১৩ আষাঢ় সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে দেবালয়ের সাপ্তাহিক উপাসনার পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপাসক সংখ্যা নর-নারীতে প্রায় চল্লিশ জন হইয়াছিল। "ঈশ্বর জাগ্রত সত্য" এই মর্ম্মে শাস্ত্রী মহাশয় যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে জ্ঞানযোগে আমরা যে সত্যকে দর্শন করি, তিনিই ব্রহ্মপুরুষ। এই ব্রহ্ম-পুরুষের উপাসনাতেই মুক্তি। ইহার প্রমাণ স্বরূপ উপনিষদের আপ্ত-বাক্য সকল প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে তার্কিক বাগ্মীদিগের আপাত মনোরম বাক্যে মুগ্ধ হইয়া অনেকের বিশ্বাসচ্যুতি ঘটিতে পারে, কিন্তু যিনি জ্ঞানের সাধনায় উপনিষদের মহান্ সত্যের ভাব হৃদগত করিতে পারেন, তাঁহার পতনের সম্ভাবনা নাই। এই উপদেশ সকলের যে হৃদ্য হইয়াছিল, উপাসনা শেষে সকলেরই ভক্তি-বিগলিত মুখের ভাবে ও ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়াছিল।

নূতন পুস্তক।—আমরা শ্রীযুক্ত ইন্দুব্রহ্মস্বামী মহাশয়ের রচিত ধর্ম্ম-সমাজ-প্রসঙ্গ নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ আছে। উহা যশোহর জেলার শ্রীরামহর গ্রামে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য। মূল্য ॥০, ছাত্রদিগের জন্য ।০ আনা।

নূতক পত্রিকা।—ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়-বান্ধব নামক একখানি মাসিক পত্র ও সমালোচনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে; উহা ডায়মণ্ডহারবার হইতে প্রকাশিত। পোদ জাতি আপনাদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনাদের উৎকর্ষ সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। এই বিশাল হিন্দু জাতির মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে, তাহারা সকলে যদি স্ব স্ব উন্নতিলাভের জন্য সচেষ্ট হন, তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুজাতির উন্নতি অচিরে সংসাধিত হয়। কেবলমাত্র তর্কসঙ্কুল পূর্ব্ব উচ্চ আভিজাত্যের স্পর্দ্ধা করিলে ফলোদয় নাই। পোদ জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আমরা কামনা করি। এই পত্রের বার্ষিক মূল্য মাশুল সহ এক টাকা মাত্র।

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল

মঙ্গল।

(পঞ্চম উপদেশের অনুবৃত্তি)

আমরা সামাজিক নীতির কথা বলিতেছি, কিন্তু সমাজ জিনিসটা কি তাহা এখনও বলা হয় নাই। আমাদের চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক্।

সর্ব্বত্রই দেখা যায়, সমাজ বিদ্যমান। যেখানে সমাজ নাই, সেখানে মানুষ মানুষের মধ্যেই গণ্য নহে। সমাজ একটি সার্ব্বভৌম তথ্য, অতএব সমাজের একটা সার্ব্বভৌম পত্তন ভূমি থাকা আবশ্যক।

সমাজের উৎপত্তির মূল কি, এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা এখন প্রবৃত্ত হইব না। গত শতাব্দীর দার্শনিকেরা এই প্রশ্নটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। যে প্রদেশটি তমসাচ্ছন্ন, সেখান হইতে কি প্রকারে আলোক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? একটা অনুমানের আশ্রয় লইয়া কিরূপে বাস্তব তথ্যের হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার হেতু নির্দ্দেশ করিবার জন্য, একটা আনুমানিক আদিম অবস্থায় আরোহণ করিবার প্রয়োজন কি? বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার অবিসম্বাদিত প্রকৃতি ও লক্ষণগুলি কি আলোচনা করিতে পারা যায় না? যাহার পূর্ণ অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, তাহা অঙ্কুরাবস্থায় কিরূপ ছিল,—অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন কি? তা ছাড়া, সমাজের মূল-উৎপত্তির সমস্যায় হস্তক্ষেপ করার একটা সঙ্কট আছে। সমাজের উৎপত্তির মূল কেহ কি অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছে? যাঁহারা বলেন পাইয়াছেন তাঁহারা করেন কি?—না, তাঁহাদের কল্পনা-প্রসূত আদিম সমাজের আদর্শ-অনুসারে তাঁহারা বর্ত্তমান সমাজের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন; রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের হস্তে নির্দ্দয়রূপে সমর্পণ করেন। কেহ বা কল্পনা করেন,—সমাজের আদিম অবস্থা একটা বলপ্রয়োগের অবস্থা, জবরদস্তির অবস্থা; এবং এই অনুমান হইতে সূত্রপাত করিয়া তাঁহারা বলেন, "জোর যার মুলুক তার", এবং এই রূপে যথেচ্ছারকে তাঁহারা একটা পূজ্য আসন প্রদান করেন। আবার কেহবা মনে করেন,

—সমাজের আদিম রূপটি পরিবারের মধ্যে অধিষ্ঠিত, এবং তাই তাঁহারা রাজশক্তিকে পিতৃস্থানীয় ও প্রজামণ্ডলীকে সন্তানের স্থানীয় মনে করেন। তাঁহাদের চক্ষে, সমাজ যেন একটি নাবালক, তাহাকে পিতৃশাসনের অধীনে, বরাবর থাকিতে হইবে, এবং যে হেতু, গোড়ায় পিতাই সর্ব্বময় কর্ত্তা, অতএব তাঁহার এই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব বরাবর বজায় রাখিতে হইবে। আবার কেহ কেহ ইহার বিপরীত সীমায় গিয়া উপনীত হন; তাঁহাদের মতে, সমাজ একটা চুক্তির ব্যাপার; এই চুক্তির বন্দোবস্তে, সর্ব্বজনের কিংবা অধিকাংশের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। তাঁহারা ন্যায়ধর্ম্মের সনাতন নিয়মকে এবং ব্যক্তির নিজস্ব অধিকারকে, জনতার চির-চঞ্চল ইচ্ছার হস্তে সমর্পণ করেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন, সমাজের শৈশবদশায়, শক্তিমান ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব, ন্যায়ত পুরোহিত সম্প্রদায়েতেই কর্ত্তৃত্বের প্রকৃত অধিকার বর্ত্তে; ঈশ্বরের গূঢ় উদ্দেশ্য তাঁহারাই অবগত আছেন এবং তাঁহারাই ঐশ্বরিক শাসনকর্ত্তৃত্বের একমাত্র প্রতিনিধি। এইরূপে, একটা দার্শনিক ভ্রান্ত মত, শোচনীয় রাষ্ট্রনীতিতে উপনীত হয়; একটা অনুমান হইতে আরম্ভ করিয়া, তাঁহাদের মতবাদ উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা যথেচ্ছাচারিতায় আসিয়া পর্য্যবসিত হয়।

যে অতীতকাল চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে, যাহার কোন চিহ্নমাত্র নাই, সেই অতীতের অন্ধকারের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের অন্বেষণ করিয়া, সেই তথ্যের উপর প্রকৃত রাষ্ট্র-বিজ্ঞানকে কখনই দাঁড় করান যাইতে পারে না। প্রকৃত রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মানব-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

যেখানেই সমাজ আছে কিংবা ছিল —সেইখানেই সমাজের নিম্নলিখিত পত্তনভূমিটি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—(১) মানুষ মানুষের সঙ্গ চায়, মানুষের মধ্যে কতকগুলি সামাজিক সহজ সংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে; (২) ন্যায় ও অধিকার সম্বন্ধে একটা স্থায়ী ধারণা আছে।

অসহায় দুর্ব্বল মানব যখন একাকী থাকে, তখন তাহার মনোবৃত্তির পুষ্টিসাধনের জন্য, তাহার জীবনকে বিভূষিত করিবার জন্য, এমন কি তাহার প্রাণধারণের জন্য, অন্য-মানুষের সাহায্য আবশ্যক বলিয়া তাহার অন্তরে একটা গভীর অভাব অনুভূত হইয়া থাকে। কোন বিচার না করিয়া, কোন প্রকার বন্দোবস্ত না করিয়া, সে তাহার সদৃশধর্ম্মী জীবদিগের নিকট হইতে বাহুবল, অভিজ্ঞতা, ও প্রেমের সাহায্য দাবী করিয়া থাকে। শিশু যখন মাকে না চিনিয়াও, মাতৃসাহায্যলাভের জন্য কাঁদিয়া উঠে, তখন তাহার সেই প্রথম ক্রন্দনেই সামাজিক সহজ-সংস্কারের ঈষৎ পরিচয় পাওয়া যায়। অনুকম্পা, সহানুভূতি, দয়া প্রভৃতি যে সকল ভাব অন্যের জন্য প্রকৃতি-দেবী আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়াছেন, সেই সকল ভাবগুলির মধ্যে এই সামাজিক সহজ-সংস্কারটি বিদ্যমান। ইহা স্ত্রীপুরুষের আকর্ষণের মধ্যে, স্ত্রীপুরুষের মিলনের মধ্যে, পিতামাতার অপত্য স্নেহের মধ্যে, এবং অন্যান্য সকল স্বাভাবিক সম্বন্ধের মধ্যে নিহিত। বিধাতা বিজনতার সহিত বিষাদের সংযোগ ও সজনতার সহিত হর্ষের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন;—তাহার কারণ, মানুষের সংরক্ষণ ও সুখসাধনের জন্য, জ্ঞান ও নীতির পরিপুষ্টির জন্য, সমাজ নিতান্তই আবশ্যক।

কিন্তু মানুষের অভাব ও সহজ সংস্কার

হইতে যে সমাজের সূত্রপাত হয়, ন্যায় বৃত্তিই তাহার পূর্ণতা বিধান করে।

একজন মানুষকে যখন আমরা সম্মুখে দেখি, তখন কোন বাহ্য নিয়মের আবশ্যক হয় না, কোন চুক্তি বন্দোবস্তের আবশ্যক হয় না,—সে মানুষ, অর্থাৎ,সে বুদ্ধিবিশিষ্ট স্বাধীন জীব, এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হয়; তাহলেই আমরা তাহার অধিকারগুলিকে সম্মান করি—সেও আমার অধিকারগুলিকে সম্মান করে। আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের পরস্পরের কর্ত্তব্য ও অধিকার সমান। সে যদি এই অধিকার-সাম্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বকীয় বলের অপব্যবহার করে, তাহলে আমিও আত্মরক্ষার অধিকার ও তাহার নিকট হইতে সম্মান আদায় করিবার অধিকার জারি করিতে প্রবৃত্ত হই। এবং যদি আমাদের দুইজনের অপেক্ষা বলবান আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি,—যাহার এই বিবাদ কলহে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই,—এইসময়ে আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়ে,—তখন সেই তৃতীয় ব্যক্তি বল প্রয়োগের দ্বারা, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, এমন কি, অন্যায়াচরণের জন্য অত্যাচারীর প্রতি দণ্ডবিধান করা তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। ইহাই সমাজের পূর্ণ আদর্শ; এবং ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য, শাসন ও দণ্ড এইগুলি সমাজের অন্তর্নিহিত মুখ্যতত্ত্ব।

ন্যায়পরতাই স্বাধীনতার প্রতিভূস্বরূপ। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব ইহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে, পরন্তু যাহা আমার করিবার অধিকার আছে তাহা করাই প্রকৃত স্বাধীনতা। প্রচণ্ড আবেগের স্বাধীনতা ও খেয়ালের স্বাধীনতার পরিণাম কি?—না, যাহারা খুব দুর্ব্বল, তাহারা বলবানের অধীন হয়, এবং যাহারা খুব বলবান তাহারা স্বকীয় উচ্ছৃঙ্খল বাসনার বশীভূত হইয়া পড়ে। প্রচণ্ড আবেগকে দমন করিয়া ও ন্যায়ের অনুগত হইয়াই মানুষ স্বকীয় অন্তরাত্মার মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে। উহাই আবার প্রকৃত সামাজিক স্বাধীনতারও আদর্শ। সমাজ আমাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে—এই যে একটি মত, ইহার ন্যায় ভ্রান্ত মত আর দ্বিতীয় নাই। স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করা দূরে থাকুক, সমাজই স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, পরিপুষ্ট করে; সমাজ স্বাধীনতাকে দমন করে না, প্রত্যুত মনের প্রচণ্ড আবেগকে দমন করে। সমাজ যেরূপ স্বাধীনতার কোন হানি করে না, সেইরূপ ন্যায়েরও কোন হানি করে না। কেননা, সমাজ আর কিছুই নহে—ন্যায়ের ভাব, বাস্তবে পরিণত হইলেই সমাজ, হইয়া দাঁড়ায়।

ন্যায়, স্বাধীনতাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমাজকেও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে। মানসিক শক্তি ও দৈহিক বলসম্বন্ধে সকল মনুষ্যের মধ্যে সমতা না থাকিলেও, তাহারা সকলেই স্বাধীন জীব;—এই স্বাধীনতার হিসাবেই সকল মনুষ্যই সমান, সুতরাং সকলেই সম্মানের যোগ্য। যখনই মানুষের মধ্যে পবিত্র নৈতিক পুরুষের লক্ষণ উপলব্ধি করা যায়, তখনই মানুষ মাত্রই একই অধিকার সূত্রে ও সমান পরিমাণে সম্মানার্হ বলিয়া বিবেচিত হয়।

স্বাধীনতার সীমা স্বাধীনতার মধ্যেই বিদ্যমান; অধিকারের সীমা কর্ত্তব্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত। স্বাধীনতা ততক্ষণই সম্মানের যোগ্য হয় যতক্ষণ অন্যের স্বাধীনতার হানি না করে। তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি তাহা অবাধে করিতে পার—শুধু এই একটি মাত্র করারে যে, তুমি আমার স্বাধীনতা

আক্রমণ করিবে না। কেননা তাহা হইলে, স্বাধীনতার সাধারণ অধিকারসূত্রেই, আমার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমি তোমার বিপথগামী স্বাধীনতাকে দমন করিতে বাধ্য হইব। সমাজ, প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রতিভূস্বরূপ; অতএব যদি একজন অপরের স্বাধীনতাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে স্বাধীনতার নামেই তাহাকে দমন করা যাইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত, ধর্ম্মমতের স্বাধীনতা একটি পবিত্র জিনিস; এমন কি, তোমার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে, কোন একটা উদ্ভট উপধর্ম্মকেও তুমি পোষণ করিতে পার; কিন্তু যদি তুমি কোন দুর্নীতিমূলক ধর্ম্মমত প্রকাশ্যে প্রচার করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার সহরাষ্ট্রিকদিগের স্বাধীনতা ও বিবেক-বুদ্ধির প্রতি আক্রমণ করা হইবে। তাই এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার নিষিদ্ধ। এইরূপ দমনের আবশ্যকতা হইতেই দমনের সুব্যবস্থিত প্রভুশক্তির আবশ্যকতা প্রসূত হয়।

ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, এই প্রভুশক্তি কতকটা আমার মধ্যেও আছে ঃ—কারণ, আমাকে অন্যায়রূপে কেহ আক্রমণ করিলে, আমারও আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু প্রথমতঃ আমি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান নহি, দ্বিতীয়তঃ আপনার কার্য্য সম্বন্ধে কেহই অপক্ষপাতী বিচারক হইতে পারে না; যাহাকে আমি বৈধ আত্মরক্ষার চেষ্টা বলিয়া মনে করি, তাহা হয়ত অন্যের প্রতি অত্যাচার বা জবর্দ্দস্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

অতএব প্রত্যেকের অধিকার রক্ষার জন্য এমন একটা অপক্ষপাতী প্রভুশক্তির প্রয়োজন যাহা ব্যক্তিবিশেষের সমস্ত শক্তি হইতে উচ্চতর।

এই প্রভুশক্তি, এই অপক্ষপাতী তৃতীয়, যাহা সকলের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য আবশ্যকীয় ক্ষমতার দ্বারা সুসজ্জিত,—এই প্রভুশক্তিকেই রাষ্ট্র শক্তি বা রাজশক্তি বলা যায়।

রাজশক্তিই সকলের ও প্রত্যেকের অধিকারের প্রতিনিধি। যে ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার, ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক সুচারুরূপে সমর্থিত হইতে পারে না—তাহা এমন একটা সর্ব্বোচ্চ প্রভুশক্তির হস্তে সমর্পিত হওয়া আবশ্যক, যে শক্তি সাধারণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে, নিয়মিতরূপে ও ন্যায্যরূপে বল প্রয়োগ করিতে পারে।

গুহাহিত।

উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন—"গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং"—অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না, তিনি লুকানো আছেন। বাইরে যা কিছু প্রকাশিত তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে—তেমনি যা গূঢ় যা গভীর তাকে উপলব্ধি করবার জন্যে আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তা' যদি না থাকতো তা হলে সে দিকে আমরা ভুলেই মুখ ফিরাতুম না; গহনকে পাবার জন্যে আমাদের তৃষ্ণার লেশও থাকত না।

এই অগোচরের সঙ্গে যোগের জন্যে আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে বলেই মানুষ এই জগতে জন্মলাভ করে' কেবল বাইরের জিনিষে সন্তুষ্ট থাকেনি। তাই সে চারিদিকে খুঁজে খুঁজে মরছে, দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্চে, তাকে কিছুতে থামতে দিচ্চে না। কোথা থেকে সে এই খুঁজে বের করবার পরোয়ানা নিয়ে সংসারে এসে উপস্থিত হল? যা কিছু পাচ্চি তার

মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে পাচ্চিনে, যা' পাচ্চিনে তার মধ্যেই আমাদের আসল পাবার সামগ্রীটি আছে—এই একটি সৃষ্টি-ছাড়া প্রত্যয় মানুষের মনে কেমন করে জন্মাল ?

পশুদের মনে ত এই তাড়নাটি নেই। উপরে যা আছে তারই মধ্যে তাদের চেষ্টা ঘুরে বেড়াচ্চে—মুহূর্ত্তকাল জন্যেও তারা এমন কথা মনে করতে পারে না যে, যাকে দেখা যায় না তাকেও খুঁজতে হবে, যাকে পাওয়া যায় না তাকেও লাভ করতে হবে। তাদের ইন্দ্রিয় এই বাইরে এসে থেমে গিয়েছে, তাকে অতিক্রম কর্‌তে পারচে না বলে' তার মনে কিছুমাত্র বেদনা নেই।

কিন্তু এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার মানুষ প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনকে কিছু-মাত্র কম করে চায় না—এমন কি, বেশি করেই চায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও মানুষ বলেছে দেখ্‌তে পাচ্চিনে কিন্তু আরও আছে, শোনা যাচ্চে না কিন্তু আরও আছে।

জগতে অনেক গুপ্ত সামগ্রী আছে যার আচ্ছাদন তুলে ফেল্লেই তা প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে, এ কিন্তু সে রকম নয়—এ আচ্ছন্ন বলে গুপ্ত নয়, এ গভীর বলে'ই গুপ্ত—সুতরাং একে যখন আমরা জান্‌তে পারি তখনো গভীর থাকে। গোরু উপরের থেকে ঘাস্ ছিঁড়ে খায়, শূকর দাঁত দিয়ে মাটী চিরে সেই ঘাসের মুথা উপড়ে খেয়ে থাকে, কিন্তু এখানে উপরের ঘাসের সঙ্গে নীচেকার মুথার প্রকৃতিগত কোন প্রভেদ নেই, দুইটি স্পর্শগম্য এবং দুটিতেই সমান রকমেই পেট ভরে। কিন্তু মানুষে গোপনের মধ্যে যা খুঁজে বের করে প্রকা-শ্যের সঙ্গে তার যোগ আছে, সাদৃশ্য নেই। তা' খনির ভিতরকার খনিজের মত তুলে এনে ভাণ্ডার বোঝাই করবার জিনিষ নয়। অথচ মানুষ তাকে রত্নের চেয়ে বেশি মূল্য-বান্ রত্ন বলে'ই জানে।

তার মানে আর কিছুই নয়, মানুষের একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে, তার ক্ষুধাও অন্তরতর, তার খাদ্যও অন্তরতর, তার তৃপ্তিও অন্তরতর।

এই জন্যেই চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্যে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এই জন্য মানুষ—আকাশে তারা আছে—কেবল এই টুকু মাত্র দেখেই মাটীর দিকে চোখ ফেরায় নি—এই জন্যে কোন্ সুদূর অতীতকালে ক্যাল্‌ডিয়ার মরুপ্রান্তরে মেষপালক মেষ চরাতে চরাতে নিশীথ রাত্রের আকাশ-পৃষ্ঠায় জ্যোতিকরহস্য পাঠ করে' নেবার জন্যে রাত্রের পরে রাত্রে অনিমেষ নিদ্রাহীন নেত্রে যাপন করেছে ;—তাদের যে মেষরা চরছিল তার মধ্যে কেহই একবারো সে দিকে তাকাবার প্রয়োজনমাত্র অনুভব করে নি।

কিন্তু মানুষ যা দেখে তার গুহাহিত দিকটাও দেখতে চায়, নইলে সে কিছুতেই স্থির হতে পারে না। এই অগোচরের রাজ্য অন্বেষণ কর্‌তে কর্‌তে মানুষ যে কেবল সত্যকেই উদ্‌ঘাটন করেছে তা বলতে পারি নে। কত ভ্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তার সীমা নেই। গোচরের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও সে প্রতিদিন এক-কে আর বলে দেখে, কত ভুলকেই তার কা-টিয়ে উঠ্‌তে হয় তার সীমা নেই, কিন্তু তাই বলে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে ত একেবারে মিথ্যা বলে' উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তেমনি অগোচরের দেশেও যেখানে আমরা গোপনকে খুঁজে বেড়াই সেখানে আমরা অনেক ভ্রমকে যে সত্য বলে' গ্রহণ করেছি

তাতে সন্দেহ নেই। একদিন বিশ্বব্যাপারের মূলে আমরা কত ভূত প্রেত কত অদ্ভুত কাল্পনিক মূর্ত্তিকে দাঁড় করিয়েছি তার ঠিকানা নেই, কিন্তু তাই নিয়ে মানুষের এই মনোবৃত্তিটিকে উপহাস করবার কোনো কারণ দেখি নে। গভীর জলে জাল ফেলে যদি পাঁক ও গুগ্‌লি ওঠে তার থেকেই জাল ফেলাকে বিচার করা চলে না। মানুষ তেমনি অগোচরের তলায় যে জাল ফেল্‌চে তার থেকে এ পর্য্যন্ত পাঁক বিস্তর উঠেছে কিন্তু তবুও তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নে। সকল দেখার চেয়ে বেশি দেখা, সকল পাওয়ার চেয়ে বেশি পাওয়ার দিকে মানুষের এই চেষ্টাকে নিয়ত প্রেরণ করা এইটেই একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার;—আফ্রিকার বন্য বর্ব্বরতার মধ্যেও যখন এই চেষ্টার পরিচয় পাই তখন তাদের অদ্ভুত বিশ্বাস এবং বিকৃত কদাকার দেবমূর্ত্তি দেখেও মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির একটি বিশেষ গৌরব অনুভব না করে থাকা যায় না।

মানুষের এই শক্তিটি সত্য এবং এই শক্তিটি সত্যকেই গোপনতা থেকে উদ্ধার করবার এবং মানুষের চিত্তকে গভীরতার নিকেতনে নিয়ে যাবার জন্যে।

এই শক্তিটি মানুষের এত সত্য যে, এ-কে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষ দুর্গমতার কোনো বাধাকেই মান্‌তে চায় না। এখানে সমুদ্র পর্ব্বতের নিষেধ মানুষের কাছে ব্যর্থ হয়, এখানে ভয় তাকে ঠেকাতে পারে না, বারম্বার নিষ্ফলতা তার গতিরোধ করতে পারে না—এই শক্তির প্রেরণায় মানুষ তার সমস্ত ত্যাগ করে এবং অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে পারে।

মানুষ যে দ্বিজ তার জন্মক্ষেত্র দুই-জায়গায়। এক জায়গায় সে প্রকাশ্য, আর এক জায়গায় সে গুহাহিত, সে গভীর এই বাইরের মানুষটি বেঁচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করচে, সেজন্য তাকে চতুর্দ্দিকে কত সংগ্রহ কত সংগ্রাম করতে হয়। তেমনি আবার ভিতরকার মানুষটিও বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই করে মরে। তার যা অন্নজল তা বাইরের জীবন রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক নয় কিন্তু তবু মানুষ এই খাদ্য সংগ্রহ করতে আপনার বাইরের জীবনকে বিসর্জ্জন করেছে। এই ভিতরকার জীবনটিকে মানুষ অনাদর করে নি—এমন কি, তাকেই বেশি আদর করেছে এবং তাই যারা করেছে তারাই সভ্যতার উচ্চশিখরে অধিরোহণ করেছে। মানুষ বাইরের জীবনটাকেই যখন একান্ত বড় করে তোলে তখন সব দিক থেকেই তার সুর নেবে যেতে থাকে। দুর্গমের দিকে গোপনের দিকে গভীরতার দিকে মানুষের চেষ্টাকে যখন টানে তখনই মানুষ বড় হয়ে ওঠে, ভূমার দিকে অগ্রসর হয়, তখনি মানুষের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে। যা সুগম যা প্রত্যক্ষ তাতে মানুষের সমস্ত চেতনাকে উদ্যম দিতে পারে না, এইজন্য কেবলমাত্র সেই দিকে আমাদের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

তাহ'লে দেখ্‌তে পাচ্ছি মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত—সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত, তাঁর সঙ্গেই কারবার করে—সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক, সেইখানেই তার স্থিতি তার গতি; সেই গুহালোকই তার লোক।

এইখান থেকে সে যা কিছু পায় তাকে বৈষয়িক পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করাই যায় না—তাকে মাপ করে' ওজন করে' দেখবার কোনো উপায়ই নেই—তাকে যদি

কোন স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তি অস্বীকার করে' বসে, যদি বলে, কি তুমি পেলে একবার দেখি—তা হলে বিষম সঙ্কটে পড়্‌তে হয়। এমন কি, যা বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রত্যক্ষ সত্যের ভিত্তিতেই যার প্রতিষ্ঠা তার সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষতার স্থূল আব্দার চলে না। আমরা দেখাতে পারি ভারী জিনিষ হাতে থেকে পড়ে যায় কিন্তু মহাকর্ষণকে দেখাতে পারি নে। অত্যন্ত মূঢ়ও যদি বলে আমি সমুদ্র দেখ্‌ব, আমি হিমালয় পর্ব্বত দেখ্‌ব, তবে তাকে একথা বল্‌তে হয় না যে, আগে তোমার চোখ দুটোকে মস্ত বড় করে তোলো তবে তোমাকে পর্ব্বত সমুদ্র দেখিয়ে দিতে পারব—কিন্তু সেই মূঢ়ই যখন ভূবিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাকে বল্‌তেই হয় একটু বোসো; গোড়া থেকে সুরু করতে হবে; আগে তোমার মনকে সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত কর তবে এর মধ্যে তোমার অধিকার হবে। অর্থাৎ চোখ মেল্‌লেই চল্‌বে না, কান খুল্‌লেই হবে না, তোমাকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। মূঢ় যদি বলে, না, আমি সাধনা করতে রাজি নই, আমাকে তুমি এ সমস্তই চোখে দেখা কানে শোনার মত সহজ করে' দাও,—তবে তাকে, হয়, মিথ্যা দিয়ে ভোলাতে হয়, নয়, তার অনুরোধে কর্ণপাত করাও সময়ের বৃথা অপব্যয় বলে' গণ্য করতে হয়।

তাই যদি হয় তবে উপনিষৎ যাঁকে "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং" বলেছেন, যিনি গভীরতম, তাঁকে দেখা শোনার সামগ্রী করে' বাইরে এনে ফেলবার অদ্ভুত আব্দার আমাদের খাট্‌তেই পারে না। এই আব্দার মিটিয়ে দিতে পারেন এমন গুরুকে আমরা অনেক সময় খুঁজে থাকি—কিন্তু যদি কোনো গুরু বলেন, আচ্ছা বেশ, তাঁকে খুব সহজ করে দিচ্চি; বলে', সেই যিনি "নিহিতং গুহায়াং" তাঁকে আমাদের চোখের সমুখে যেমন খুসি এক রকম করে' দাঁড় করিয়ে দেন তাহলে বলতেই হবে, তিনি অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরো গোপন করে দিলেন। এ রকম স্থলে শিষ্যকে এই কথাটাই বল্‌বার কথা যে, মানুষ যখন সেই গুহাহিতকে, সেই গভীরকে চায়, তখন তিনি গভীর বলে'ই তাঁকে চায়—সেই গভীর আনন্দ আর কিছুতে মেটাতে পারে না বলে'ই তাঁকে চায়—চোখে দেখা কানে শোনার সামগ্রী জগতে যথেষ্ট আছে—তার জন্যে আমাদের বাইরের মানুষটা ত দিন রাত ঘুরে বেড়াচ্চে কিন্তু আমাদের অন্তরতর গুহাহিত তপস্বী সে সমস্ত কিছু চায় না বলে'ই একাগ্রমনে তাঁর দিকে চলেছে। তুমি যদি তাঁকে চাও তবে গুহার মধ্যে প্রবেশ করে'ই তাঁর সাধনা কর, এবং যখন তাঁকে পাবে তোমার "গুহাশয়" রূপেই তাঁকে পাবে—অন্যরূপে যে তাঁকে চায় সে তাঁকেই চায় না; সে কেবল বিষয়কেই অন্য একটা নাম দিয়ে চাচ্চে। মানুষ সকল পাওয়ার চেয়ে যাঁকে চাচ্চে তিনি সহজ বলেই তাঁকে চাচ্চে না—তিনি ভূমা বলেই তাঁকে চাচ্চে। যিনি ভূমা, সর্ব্বত্রই তিনি গুহাহিতং,—কি সাহিত্যে, কি ইতিহাসে, কি শিল্পে, কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে।

এই যিনি সকলের চেয়ে বড়, সকলের চেয়ে গভীর, কেবলমাত্র তাঁকে চাওয়ার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। সেই ভূমাকে আকাঙ্ক্ষা করাই আত্মার মাহাত্ম্য—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি—এই কথাটি যে মানুষ বল্‌তে পেরেছে এতেই তার মনুষ্যত্ব। ছোটোতে তার সুখ নেই, সহজে তার সুখ নেই, এই জন্যেই সে গভীরকে